নব বোধন।

(উপন্যাস)

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ

প্রণীত।

কলিকাতা।

মাঘ ১৩১৩।

মূল্য ১৲ [illegible]

Published and Printed by
Chaturbhuj Bhattacharja,
At The "KRISHNA PRESS."
309, Upper Chitpur Road,
Calcutta.

উৎসর্গ।

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

স্বর্গীয় পিতৃদেবের

চরণোদ্দেশে

আমার সাহিত্য-সেবার এই

প্রথম ফল

অর্পণ করিলাম।

প্রণত

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

একদিন অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্রের বিমল প্রভায় যে সাহিত্যক্ষেত্র আলোকিত হইয়াছিল, আজিও বহু সাহিত্য-রথীর স্নিগ্ধ কিরণে যে ক্ষেত্র সমুজ্জ্বল, সেই সুবিশাল সাহিত্য-ক্ষেত্রের দ্বারপ্রান্তে আমি আজ নূতন অতিথি। কিন্তু কেন আমার এ প্রয়াস?

আমার এই প্রয়াসের—এই ধৃষ্টতার একটু কারণ আছে। যিনি বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে প্রধান রথিরূপে দণ্ডায়মান, সেই প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ এম্, আর, এ, এস মহোদয়ই আমার হৃদয়ে এই ধৃষ্টতা জাগাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং বঙ্গসাহিত্যের উপর আমার এই অভিনব অত্যাচারের জন্য তিনিই কতকটা দায়ী। আমি এক্ষণে তাঁহারই চরণ স্মরণ করিয়া তন্নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইলাম। পরিণাম? পরিণাম, সর্ব্বদর্শী ভগবানের গোচর।

বর্ত্তমান গ্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও কেবল কয়েকটী নাম ব্যতীত ইহার আর সমস্তই কাল্পনিক; সুতরাং পাঠকগণ যেন ইহাকে কেবল উপন্যাস রূপেই গ্রহণ করেন।

কলিকাতা। }
মাঘ, ১৩১৩। }

শ্রীনারায়ণচন্দ্র শর্ম্মা।

নব বোধন।

প্রথম খণ্ড।

বোধন।

"সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥"

গীতা ২। ৩৮

নব বোধন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্বশুরবাড়ী।

রূপনাথ চক্রবর্ত্তী শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলেন। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তখন রূপনাথের পিতামাতা উভয়েই জীবিত ছিলেন। কিন্তু বিবাহের পর এক বৎসর মধ্যেই পিতা স্বর্গারোহণ করিলেন, মাতাও তাঁহার সহিত অনুমৃতা হইলেন। রূপনাথ গুরুগৃহে বাস করিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। কাজেই আর তাঁহার শ্বশুরবাড়ী যাওয়া ঘটিল না, পত্নী কমলারও কোন সংবাদ লওয়ার সুবিধা হইল না। গীতার কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, বেদান্তের মায়াবাদ, সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ প্রভৃতির মধ্যে কমলা চাপা পড়িয়া গেল। ইহার মধ্যে শাশুড়ী অনেক

বার জামাতাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু জামাতা তখন ব্রহ্মসূত্রের শারীরক ভাষ্যের সহিত দ্বৈতবাদীর মতদ্বৈধের মীমাংসায় ব্যস্ত। সুতরাং তিনি শাশুড়ীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই।

পাঁচ বৎসর পরে অধ্যয়ন সমাপ্ত হইল। তখন গুরুদেব তাঁহাকে সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবার জন্য অনুমতি দিলেন। অনুমতি পাইয়া রূপনাথ কমলাকে আনিবার জন্য শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিলেন।

রূপনাথের বয়ঃক্রম দ্বাত্রিংশৎবর্ষ হইবে। দেখিতে সুপুরুষ না হইলেও তাঁহার দেহ বেশ সুগঠিত, বলিষ্ঠ; বাহুদ্বয় মাংসল, বক্ষঃ বিস্তৃত, লোচনদ্বয় উজ্জ্বল, তেজোব্যঞ্জক; প্রশস্ত ললাট জ্ঞান ও মহত্ত্বের ক্রীড়াভূমি; হৃদয় ধর্ম্মভাব পরিপূর্ণ, সরল ও উদার। ফল কথা, রূপনাথ একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, শক্তিশালী, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।

বাসগ্রাম দেবীগড়া; শ্বশুরবাড়ী রাজনগরে। মধ্যে পাঁচক্রোশ ব্যবধান। মাঠের উপর দিয়া রাস্তা। নৈদাঘ সূর্য্যকিরণে বিস্তৃত মাঠ যেন জ্বলিতেছিল। রূপনাথ সেই রৌদ্রতপ্ত মেঠোপথ ভাঙ্গিয়া ঘর্ম্মাক্তদেহে রাজনগর অভিমুখে যাইতেছিলেন।

তা' ইহা একালের রূপনাথের শ্বশুরালয় যাত্রা হইলে

আমরা অনায়াসেই তাঁহার মনোভাবটা বর্ণনা করিতে পারিতাম। কিন্তু সেই দুইশত বৎসর পূর্ব্বে গুরুগৃহ হইতে অচির প্রত্যাগত রূপনাথের হৃদয় ভাবটা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কারণ তিনি যে তখন অচিরাধীত "ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিঃ পরমপুরুষার্থঃ" এই সাংখ্যোক্তির পরিবর্ত্তে, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মাত্র তিনটী দিনের পরিচিতা একটী লজ্জাবতী বালিকার লজ্জানত মুখখানি ভাবিতেছিলেন, ইহা আমরা কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারিব না। সুতরাং আমাদের বর্ণনাও এস্থলে অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

রূপনাথ আহারান্তে বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, সুতরাং অপরাহ্ণের সমস্ত রৌদ্রটা ভোগ করিতে করিতে সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে রাজনগরে উপস্থিত হইতে হইল। তখন কৃষকবধূগণ সন্ধ্যা প্রদীপ হস্তে গোশালায় প্রবেশ করিতেছে।

রূপনাথের শ্বশুরবাড়ী গ্রামের মাঝখানে। বাড়ীখানি ছোট—ব্রাহ্মণপল্লীর মধ্যে অবস্থিত। বাড়ীর মধ্যে দুইটী স্ত্রীলোক—কমলা এবং তাহার মাতা। তা' ছাড়া আর কেহ নাই। কমলা সন্ধ্যার প্রদীপটী হস্তে লইয়া তুলসী তলায় প্রণাম করিতেছিল, তাহার মাতা গৃহের দাবায় বসিয়া হরিনামের মালা ঘুরাইতেছিলেন। এমন সময় বাহিরে কে দরজা ঠেলিল। কমলা প্রণাম করিতে করিতে না উঠিয়াই

কেবল মাথাটী তুলিয়া একবার দ্বারের দিকে চাহিল; তাহার মাতা জিজ্ঞাসিলেন,—"কে গা?"

উত্তর আসিল,—"আমি রূপনাথ।"

আর কোন কথা মনে থাক বা না থাক, রূপনাথ নামটী কমলা ভুলে নাই। সে তাড়াতাড়ি প্রণামটা সারিয়া লইয়া প্রদীপ হস্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; তাহার বুকটা গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল। ভাবিল, "ঠাকুর! এতদিনে কি আমার প্রণাম করা সার্থক হইল?" কমলার মাতা মাথার কাপড়টা কপাল পর্য্যন্ত টানিয়া দিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন; রূপনাথ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কমলার মাতা তাড়াতাড়ি একখান কম্বল আনিয়া দাবার উপর পাতিয়া দিলে ক্লান্ত পথশ্রান্ত রূপনাথ তাহাতে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই এক হাত ঘোমটা টানিয়া কমলা এক গাড়ু জল তাঁহার নিকট রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। রূপনাথ একবার ঈষৎ কটাক্ষে সে দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, সেই দশমবর্ষীয়া বালিকা এক্ষণে পঞ্চদশবর্ষীয়া যুবতী; সেই প্রভাতের উন্মেষোন্মুখী পদ্মটী এক্ষণে মধ্যাহ্ন-রবিকরোদ্ভাসিতা বিস্তৃত-দলশালিনী নলিনী; বহুদূর-দৃষ্টা সেই ক্ষীণা নির্ঝরিণী এখন বীচিমালিনী পূর্ণতোয়া জাহ্নবী। রূপনাথের শাস্ত্রচর্চ্চানিরত হৃদয়টা বুঝি একটু উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

তারপর শাশুড়ী আসিয়া কুশল প্রশ্নাদির পর এই পাঁচ বৎসরের অনেক কথাই কহিলেন। কমলার পিতার লোকান্তর প্রাপ্তি, বৈষয়িক গোলযোগ, কমলার কঠিন পীড়া প্রভৃতি ঘটনানিচয় একে একে বিবৃত করিতে করিতে কখনও কাঁদিলেন, কখনও আক্ষেপ করিলেন; শেষে দুই চারিটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাহিনী সমাপ্ত করিলেন। তারপর তিনি উঠিয়া জামাতার আহারের উদ্যোগ করিতে গেলেন। রূপনাথ হস্তপদাদি ধৌত করিয়া সন্ধ্যাহ্নিকে বসিলেন।

আহারান্তে রূপনাথ শাশুড়ীর নিকট কমলাকে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কমলার মাতা কিছু মাত্র আপত্তি না করিয়াই জামাতার কথায় সম্মতি দিলেন। রূপনাথ একটু বিস্মিত হইলেন। মাতা যে এত শীঘ্র এক কথায় কন্যাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইতে সম্মত হয়, ইহা তিনি এই প্রথম দেখিলেন। কিন্তু রাত্রিকালে যখন তিনি কমলার নিকট ভিতরের সমস্ত কথা শুনিলেন, তখন তাঁহার এই বিস্ময় ক্রোধে ও ঘৃণায় পরিবর্ত্তিত হইল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে আমাদিগকে আর একটু আগেকার কথা বলিতে হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

——০:):*:(:০——

ফৌজদার সাহেব।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনও মোগল-সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই; তখনও ইংরাজ বণিকগণের হৃদয়ে ভারতে রাজ্যস্থাপনের কল্পনা উদিত হয় নাই; তখনও তাঁহারা সোণার ভারতের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সকাতর-নয়নে মোগল-সম্রাটের কৃপাভিক্ষা করিতেছিলেন। তবে ঔরঙ্গজেবের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত মুসলমান-সাম্রাজ্য তখন ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, বিশাল সমুদ্রহৃদয়ে অল্পে অল্পে প্রলয়তরঙ্গ উঠিতেছিল। সুশাসনের অভাবে তখন বঙ্গদেশ এক প্রকার অরাজক হইয়া উঠিয়াছিল। স্থানে স্থানে বিদ্রোহ ও দস্যুর উৎপীড়নে বঙ্গদেশে তখন কিরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। নিয়মিত সময়ে নির্দ্দিষ্ট রাজকর হস্তগত করিয়াই বঙ্গের তাৎকালীন সুবেদার মুর্শিদ কুলিখাঁ আপনার কর্ত্তব্যশেষ বোধে নিশ্চিন্ত হইতেন;

এদিকে প্রজাগণ প্রতিনিয়ত বিবিধ অত্যাচারে উৎপীড়িত হইত। কিন্তু তাঁহার বিলাস-বিঘূর্ণিত দৃষ্টি সে দিকে পড়িত না। স্থানে স্থানে এক একজন ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও ন্যায়ের সঙ্কীর্ণপন্থা পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের ইচ্ছানুসারে প্রজাশাসন বা উৎপীড়ন করিতেন। ইঁহাদের শাসন প্রভাবে নিরীহ প্রজাবর্গ আরও অধিকতর পর্য্যুদস্ত হইত। কিন্তু সেই অমোঘ শাসনের প্রতিরোধ করিবার শক্তি কাহারও ছিল না।

আমাদিগের বর্ণনীয় সময়ে রাজনগরে রস্তম আলি নামক জনৈক ফৌজদার বাস করিতেন। তাঁহার অধীনে প্রায় তিন শত সিপাহী ছিল। সিপাহিরা বেতনভোগী ছিল না, তাহারা জমি ভোগ করিত। তাহাদিগকে সর্ব্বদা ফৌজদারের নিকট উপস্থিত থাকিতে হইত না। তাহারা সাধারণ প্রজার ন্যায় গৃহে বসিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, আবশ্যক হইলে সমবেত হইয়া ফৌজদারের কার্য্য সাধন করিয়া দিত। কেবল কয়েকজন মাত্র বেতনভোগী সিপাহী সর্ব্বদা ফৌজদারের নিকট থাকিত। এই ফৌজদারগণের হস্তেই দেশের শাসন ও বিচারভার অর্পিত ছিল। কিন্তু অনেক স্থলেই তাঁহারা এই গুরুতর কর্ত্তব্যের অপব্যবহার করিয়া দেশে অশান্তির সূত্রপাত করিতেন। রস্তম আলিও এই

সাধারণ পদ্ধতির বহির্ভূত ছিলেন না। সে সময়ে তিনিই একপ্রকার দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িয়াছিলেন ; তাঁহার প্রবল শাসনে দেশ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে একটী কথা কহিতেও কেহ সাহসী হইত না। সাধারণে তাঁহাকেই প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট্ বলিয়া জানিত ; অন্য সম্রাটের কল্পনা করিতেও তাহারা ভীত হইত।

রস্তম আলি কেবল যে দুর্ব্বল প্রজাগণের অর্থশোষণ করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন, এরূপ নহে ; তাঁহার ভয়ে গৃহস্থের কুলবালাগণ অন্তঃপুরে বসিয়া সর্ব্বদা কাঁপিত। তাঁহার দুর্দ্দম ইন্দ্রিয়লালসা পরিতৃপ্তির জন্য কত সতীকে যে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে, কত হতভাগিনী যে আত্মহত্যা করিয়া আপনার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই বলিলেই হয়। দুর্ভাগ্য ক্রমে যে একবার ফৌজদার সাহেবের শুভ দৃষ্টিতে পড়িত তাহার আর রক্ষা ছিল না। ছলে, বলে, কৌশলে, যেরূপেই হউক, তাহাকে হস্তগত করিয়া এবং তাহার সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া ফৌজদার সাহেব নিশ্চিন্ত হইতেন। অনেক কুলাঙ্গার হিন্দুও এ বিষয়ে তাঁহার সাহায্যকারী ছিল। তাহারা গোপনে সুন্দরী কুলস্ত্রীগণের সংবাদ আনিয়া এবং তাহার সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া ফৌজদারের লালসানল উদ্দীপিত করিত ; অমনই ক্ষুধার্ত্ত শ্বাপদের ন্যায় রস্তম আলির

লোলুপ দৃষ্টি সেই দিকে পড়িত। ইহাতে যে সময়ে সময়ে দুই একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধিত না এরূপ নহে; কিন্তু দুর্দান্ত ফৌজদারের নিকট প্রজাবর্গের ক্ষীণশক্তি অচিরেই পরাভূত হইত। এইরূপে গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে হাহাকারের উচ্চ রোল উঠিত। কিন্তু হতভাগ্য প্রজাপুঞ্জের সে আর্ত্তনাদ সুদূর দিল্লীর সিংহাসন প্রান্তে পৌছিতে পারিত না।

এই সময়ে একদিন রূপলাবণ্যময়ী কমলার অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি রুস্তম আলির দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সে রূপ দেখিয়া তাঁহার নয়ন ঝলসিয়া গেল, এই দেবভোগ্য সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিবার জন্য তাঁহার লালসানল-প্রদীপ্ত হৃদয় লালায়িত হইয়া উঠিল। তিনি কমলার নিকট দূতী প্রেরণ করিলেন।

দূতী আসিয়া কমলাকে ফৌজদারের অভিপ্রায় জানাইল। শুনিয়া কমলার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুঃখে ঘৃণায় তাহার মরিতে ইচ্ছা হইল। কমলার মাতাও সমস্ত শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হায়, এ দুঃসময়ে কে তাঁহার কমলাকে রক্ষা করিবে? কে তাঁহার জন্য দুর্দ্দান্ত ফৌজ-দারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহসী হইবে? অসহায়া বিধবা কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। এদিকে মধ্যে মধ্যে দূতী আসিয়া ভয় ও প্রলোভন দ্বারা কমলাকে বাধ্য করিতে চেষ্টিতা হইল।

যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই রস্তম আলি অধৈর্য্য হইয়া পড়িতে লাগিলেন। দূতী তাঁহাকে সবুরে এই মেওয়া ফল লাভের লোভ দেখাইয়া আশ্বস্ত করিতে লাগিল। কিন্তু সেই শুষ্ক আশ্বাসবাণী শুনিয়া আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বল প্রকাশের বাসনা ব্যক্ত করিলেন। দূতী তাঁহার নিকট তিন দিন সময় লইল। এদিকে কমলাও কোন উপায় না দেখিয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত হইল; মাতাও দেবতার নিকট অবশেষে প্রিয়তমা কন্যার মৃত্যুকামনা করিতে লাগিলেন।

ঠিক্ এই সময়েই রূপনাথ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কমলার হৃদয় অনেকটা স্থির হইল; তাহার মাতাও বুঝিলেন, ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। রূপনাথ কমলার নিকট সমস্ত শুনিলেন; শুনিয়া, ক্রোধে ক্ষোভে তিনি উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু উপায় কি? এই ভীষণ ব্যাঘ্রকবল হইতে কমলাকে কিরূপে মুক্ত করিবেন? রূপনাথ অনেক ভাবিলেন, কমলাও তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া অনেক কাঁদিল। শেষে স্থির হইল, কল্যই এথান হইতে কমলাকে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।

প্রাতঃকালে উঠিয়া রূপনাথ পাল্কীবেহারা ডাকিতে গেলেন। কিন্তু ফৌজদারের অভিপ্রায় গ্রামের সকলেই

অবগত হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার বিরাগাশঙ্কায় তাঁহার আদেশ ব্যতীত কেহই যাইতে স্বীকৃত হইল না। অনেক চেষ্টার পর রূপনাথ হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কমলাকে বলিলেন,—"এখন উপায় ?"

কমলা বলিল,—"আমি হাঁটিয়াই যাইব।"

রূপনাথ বলিলেন,—"পারিবে ?"

কমলা বলিল,—"পারিব।"

একটু ভাবিয়া রূপনাথ বলিলেন,—"কিন্তু পথে যদি বিপদ ঘটে ?"

কমলা স্বামীর মুখপানে চাহিয়া বলিল,—"তুমি সঙ্গে থাকিবে, তবে আবার বিপদ কোথায় ?"

রূপ। ফৌজদার নিশ্চিন্ত থাকিবে না—সম্ভবতঃ সে বাধা দিবে।

কম। তুমি যখন আসিয়াছ, তখন আমি তাহাকে আর ডরাই না।

রূপ। আমি একা, ফৌজদারের বিরুদ্ধে কি করিতে পারি ?

কম। কি না পার ? আমার শ্বশুরের নাম, আমার পিতার নাম দেশ-বিখ্যাত। একদিন তাঁহারা ফৌজদারকে কাঁপাইয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিরা আজ কি এতই

দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা আত্মরক্ষাও করিতে পারে না?

রূপ। কমলা, একটা কথা তুমি বিস্মৃত হইতেছ। তাঁহারা ডাকিলে সে সময় সহস্র লোক প্রাণ দিতে ছুটিয়া আসিত; এখন তুমি আমি বিপদে পড়িয়া সকাতরে সাহায্য প্রার্থনা করিলে একজনও আসিবে না।

কম। না আসে ক্ষতি নাই—মরিতে তো জানি। কিন্তু—

রূপ। তবে আর কিন্তু কি?

কম। কিন্তু একটা ভয় হয়।

রূপ। কিসের জন্য?

কম। তোমার জন্য।

রূপ। আমার জন্য?

কম। হাঁ; ভয় হয় পাছে ফৌজদার তোমায় যাতনা দেয়।

রূপ। আমার জন্য ভেবো না কমলা। যদি মরিতে হয়, তাহা হইলে ফৌজদারকে এমন শিক্ষা দিয়া মরিব যে, স্ত্রীলোকের উপর সে আর কখন অত্যাচার করিবে না। সে কথা এখন যাক্,—ঘরে ভাল লাঠী আছে?

"আছে" বলিয়া কমলা তাহার পিতার আমলের চাকর

মধুসর্দ্দারের একটা পাকা বাঁশের মোটা লাঠী বাহির করিয়া আনিল। রূপনাথ তৈলে জলে সুপক্ক সেই লাঠীটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন,—"তবে প্রস্তুত হও।"

কমলা প্রস্তুত হইয়া আসিল। রূপনাথ দেখিলেন, তাহার হাতে একখান মরিচাধরা তরোয়াল। তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"ওটা কি হইবে? যুদ্ধ করিবে না কি?"

কমলা বলিল, —"না, আত্মরক্ষা করিব।"

তখন পতিপত্নী দুর্গানাম স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলেন। কমলার মাতা অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে উভয়ে দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে বৃদ্ধা তুলসী তলায় মাথা কুটিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ঠাকুর! আজ আমার স্বামীর কুলমান রক্ষা কর, সতীর সতীত্ব বজায় রাখ।"

বৃদ্ধা একে একে স্বামী, পুত্র, ঐশ্বর্য্য সকল হারাইয়া কেবল কমলাকে লইয়াই বুক বাঁধিয়াছিলেন। আজি সেই কমলাও তাঁহার শূন্য হৃদয়টাকে আরও শূন্য করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধার হৃদয়রুদ্ধ শোকাবেগ উথলিয়া উঠিল। তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সহসা একটা গোলমাল—একটা অস্ফুট চীৎকার ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ছুটিয়া

দ্বারের নিকট গেলেন; কিন্তু কিসের গোলমাল তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কেবল দূরোত্থিত একটা গোলযোগের অস্ফুট ধ্বনি তাঁহার কাণে বাজিতে লাগিল। তিনি দুই হাতে বুক চাপিয়া বলিলেন,—"রক্ষা কর ঠাকুর, রক্ষা কর; কমলা বাঁচিয়া থাকিতে যেন আমার স্বামীর কুলমান—কন্যার সতীত্ব নষ্ট না হয়।"

সতীত্ব বজায় করিতে কমলা যদি মরে, তাহাতেও বৃদ্ধার বুঝি তত কষ্ট নাই। হায়, এমনই সতীত্ব!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

লাঠীবাজী।

রূপনাথের অনুমান যথার্থ হইল। তাঁহারা গ্রাম পার হইতে না হইতেই তাঁহাদের পলায়ন সংবাদ ফৌজদারের কর্ণগোচর হইল। অবিলম্বে উভয়কে ধরিবার জন্য দশবারো-জন সিপাহী ছুটিল।

রূপনাথ ও কমলা যখন গ্রামপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন, তখন সিপাহীগণ আসিয়া তাঁহাদের গতিরোধ করিল। রূপনাথ ভ্রুকুটী করিয়া তাহাদের দিকে ফিরিলেন; কমলার বুকের ভিতর একটু কাঁপিয়া উঠিল। সে স্বামীর কাছে আরও একটু সরিয়া, অঙ্গে অঙ্গ সংলগ্ন করিয়া দাঁড়াইল। দুইজন সিপাহী অগ্রসর হইয়া তাহাকে ধরিতে উদ্যত হইল; কিন্তু তাহারা অসম্ভাবিত রূপে বাধা পাইল; রূপনাথ একজনকে পদাঘাতে এবং অপর ব্যক্তিকে মুষ্ট্যাঘাতে ভূপাতিত করিলেন। তদ্দৃষ্টে অন্যান্য সিপাহীরা একযোগে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তখন রূপনাথের সবল হস্তে সেই পাকা বাঁশের

লাঠী সশব্দে বিদ্যুদ্বেগে ঘুরিতে লাগিল। সিপাহীদের হাতেও এক একখান লাঠী ছিল; কিন্তু রূপনাথের সেই অদ্ভুত লাঠীচালনা দেখিয়া সকলেই মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল—মুহূর্ত্তের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রহিল। পরক্ষণেই একজন সিপাহী লাঠী ঘুরাইয়া অগ্রসর হইল। অমনই রূপনাথের ঘূর্ণিত লাঠী সবেগে তাহার উপর পড়িল; সিপাহী ধরাশায়ী হইল। আবার একজন গেল, সেও পড়িল। তখন ক্রুদ্ধ সিপাহীগণ হুঙ্কার দিয়া সকলে একযোগে রূপনাথকে আক্রমণ করিল। অদূরে গ্রামবাসিগণ নীরবে দাঁড়াইয়া এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিতে লাগিল। রূপনাথ একবার চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"যদি তোরা লাঠী ধর্‌তে শিখে থাকিস্‌, তবে একে একে আয়।"

কিন্তু উন্মত্ত সিপাহীগণের কর্ণে তাঁহার কথা প্রবেশ করিল না। তাহারা সকলেই এককালে লাঠী চালাইতে থাকিল। চারিদিক হইতে রূপনাথের উপর লাঠীবৃষ্টি হইতে লাগিল। অদূরে দাঁড়াইয়া কমলা কাতরকণ্ঠে ডাকিল,—"কোথায় হে অনাথনাথ! আজি রমণীর সর্ব্বস্ব রক্ষা কর ঠাকুর!"

রূপনাথের শিক্ষা অসাধারণ। তিনি এই দশজন সিপাহীর সমকালীন আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া কৌশলে

তাহাদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তে লাঠী চক্রবৎ ঘুরিতে লাগিল। সে বেগের নিকট যে পড়িল, সে-ই ধরাশায়ী হইল। দেখিতে দেখিতে আরও দুইজন সিপাহী পড়িল। তখন অবশিষ্ট সিপাহীগণ ক্রুদ্ধশার্দ্দূলবৎ গর্জ্জন করিয়া তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। রূপনাথ আপনার অবস্থা বুঝিলেন, চকিতের মত নিরাশদৃষ্টিতে একবার কমলার মুখের দিকে চাহিলেন; পরক্ষণেই সম্মুখস্থ সিপাহীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া লাঠী তুলিলেন। এই অবসরে পশ্চাৎ হইতে দুইখান লাঠী তাঁহার মাথার উপর উঠিল কমলা তাহা দেখিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার হৃদয়ে এক মহাশক্তির আবির্ভাব হইল, মুহূর্ত্তে তাহার হস্তস্থিত তরবারী আততায়িদ্বয়ের মধ্যে একের বক্ষ ভেদ করিল। সিপাহী চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল। অপর লাঠীখানা রূপনাথের স্কন্ধে পড়িল, কিন্তু পতনোন্মুখ সিপাহীর দেহে বাধা পাইয়া তাহার বেগ প্রতিহত হইয়াছিল।

তখন রূপনাথের উত্থিত লাঠী সম্মুখস্থ সিপাহীর মাথায় পড়িয়াছে। সহসা পশ্চাৎ হইতে আহত হইয়া রূপনাথ ফিরিয়া চাহিলেন। অমনই কমলার সেই রৌদ্রমধুর মূর্ত্তি তাঁহার নয়নে পড়িল; সে মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার ছয়খান লাঠী উত্থিত হইল, সঙ্গে

সঙ্গে কমলার শোণিতরঞ্জিত তরবারী প্রভাত-সৌর-কিরণে আবার ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তে তাহা এক সিপাহীর পঞ্জর ভেদ করিল। রূপনাথও আপনার লাঠী ঘুরাইয়া আঘাতের প্রতিরোধ করিলেন। সিপাহীগণের লাঠী তাঁহার লাঠীতে প্রতিহত হইল; কেবল একখান লাঠী প্রতিহত হইয়াও তাঁহার বাহুমূলে পড়িল। মুহূর্ত্তে কমলার শোণিত-সিক্ত-ভুজধৃত তরবারী আবার উত্থিত হইল। অবশিষ্ট সিপাহীগণ সবিস্ময়ে একবার সেই শোণিতরঞ্জিতবসনা ক্রোধ-জ্বলিতনয়না দংশিতাধরা দানবদলনী মূর্ত্তির দিকে চাহিল, পরক্ষণেই তাহারা যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া পলাইল। কমলা পড়িয়া যাইতেছিল, রূপনাথ তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তারপর তিনি কমলার সেই অবসন্ন দেহ বক্ষে লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গেল।

পরাজিত সিপাহীগণ সাহস করিয়া কেহ ফৌজদার সাহেবের নিকট অগ্রসর হইতে পারিল না। তাহারা জানিত যে, এ সংবাদ শুনিলে ফৌজদার সাহেব তাহাদিগকে আস্ত রাখিবে না। কিন্তু অধিকক্ষণ ইহা অপ্রকাশ রহিল না। ফৌজদার সাহেব সমস্ত সংবাদ শুনিলেন; শুনিয়া তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ একশত সিপাহীকে সশস্ত্রে

উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ প্রচারিত হইল। অমনই চারিদিকে একটা সাজ্ সাজ্ রব উঠিল, গ্রামের মধ্যে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল।

তারপর যখন সিপাহীরা সাজিয়া গুজিয়া, হাতিয়ার বাঁধিয়া ফৌজদার সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল, তখন বেলা প্রায় একপ্রহর অতীত হইয়াছে। রস্তম আলি অপরাধীদ্বয়কে ধরিয়া আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। তখন সিপাহীরা সগর্ব্ব পদক্ষেপে গ্রামবাসিগণকে ভীত ও চমকিত করিয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইল। কিন্তু সেখানে আহত কয়েকজন সিপাহী ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না। অগত্যা সকলে সেই পতিত সিপাহীগণকে লইয়াই ফৌজদারের নিকট উপস্থিত হইল এবং যথাযথ নিবেদন করিল। ক্রুদ্ধ রস্তম আলি বক্তাকে সবলে পদাঘাত করিয়া আদেশ দিলেন,—"যেখানে পাও, সেই দুরন্ত কাফেরটাকে ধরিয়া লইয়া আইস।"

প্রভুভক্ত সিপাহীদল তখন কাফেরের অন্বেষণে চারিদিকে ছুটিল। তাহাদের মধ্যে কেহই যে রূপনাথকে চিনিত না, ইহা বলাই বাহুল্য। আর চিনিলেই বা কি হইত। কারণ, তাহারা যখন সেই মধ্যাহ্নের রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, নদীতীরে, ঝোপের মধ্যে, গাছের ডালে অপরাধীর অন্বেষণ করিয়া

ফিরিতেছিল, রূপনাথ তখন দেবীগড়ায় আপনার গৃহে উপস্থিত হইয়া অচেতন-প্রায়া কমলার শুশ্রূষা করিতেছিলেন।

এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, আমাদের বর্ণনীয় কালে উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই লাঠীখেলা একটা সাধারণ ক্রীড়ার মধ্যে পরিগণিত ছিল। প্রায় সকলেই তাহাতে অল্পবিস্তর শিক্ষিত হইত। বিংশশতাব্দীর সুসভ্য পাঠকসমাজ এ কথাটায় ততদূর বিশ্বাসস্থাপন করুন বা না করুন, কিন্তু সেই অসভ্য যুগে লাঠীর সহায়েই যে বাঙ্গালী আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষা করিয়াছিল, এবং এই বাঁশের লাঠীর বলেই যে একজন শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ স্বীয় পত্নীকে দুর্দ্দান্ত ফৌজদারের কবল হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয়। হায়, সেই বাঙ্গালী আমরা লাঠী ছাড়িয়া আজি অস্ত্র আইনের প্রতিবাদের জন্য উচ্চ চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

——০:):*:(:০——

ব্রতগ্রহণ।

দেবীগড়ার বৃদ্ধ জমিদার রণজিৎ রায় প্রাতঃকালে কর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গে বেষ্টিত হইয়া জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্যাদি পরিদর্শন করিতেছিলেন। এমন সময় রূপনাথ তথায় উপস্থিত হইয়া রায় মহাশয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রায় মহাশয় উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে, রূপনাথ ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। সে আসন স্বতন্ত্র এবং জমিদার মহাশয়ের আসন হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ।

অনেকক্ষণ পরে জমিদারী কার্য্যাদি পরিদর্শন শেষ হইল, কয়েকজন প্রধান কর্ম্মচারী ব্যতীত আর সকলে চলিয়া গেল। তখন রায় মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া রূপনাথ বলিলেন,—আপনার নিকট আমার এক আবেদন আছে।"

রায় মহাশয় বলিলেন,—"কি আবেদন ?"

রূপনাথ বলিলেন,—"অধ্যয়ন শেষে গুরুদেব কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সম্প্রতি আমি সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছি,

এবং তজ্জন্য আমার পরিণীতা পত্নীকে স্বগৃহে আনয়ন করিয়াছি।"

রায় মহাশয় বলিলেন,—"উত্তম করিয়াছ। সংসারাশ্রমই শ্রেষ্ঠ আশ্রম; আর সহধর্ম্মিণীই তাহাতে প্রধান সহায়। তা' এজন্য কি সংসারের বিশেষ কোন অভাব হইয়াছে?"

রূপনাথ বলিলেন,—"অভাব যথেষ্ট। কিন্তু অদ্য আমি তজ্জন্য আপনার নিকট সাহায্যপ্রার্থী নহি। এক্ষণে আমি এবং আমার পত্নী ঘোর বিপদগ্রস্ত।"

রায় মহাশয় সবিস্ময়ে বলিলেন,—"বিপদ!"

তখন রূপনাথ একে একে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন, কেবল কমলার অস্ত্রধারণের কথাটা গোপন করিলেন। সমস্ত শুনিয়া রায় মহাশয় একটু চিন্তা করিলেন; বলিলেন,—"এক্ষণে আমাকে কি করিতে বল?"

রূপ। যদিও আমি কোনরূপে সেখান হইতে স্ত্রীকে উদ্ধার করিয়াছি, তথাপি এখনও আমরা সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত হইতে পারি নাই। ফৌজদার সহজে ছাড়িবে না। বিশেষতঃ আমার হস্তে তাহার কয়েকজন সিপাহী হত হইয়াছে। অতএব ফৌজদার যে ইহার একটা প্রতিকার না করিয়া নিরস্ত হইবে, এরূপ বোধ হয় না।

রায়। কাজটা ভাল কর নাই।

রূপ। ইহা ভিন্ন তখন আর অন্য উপায় ছিল না।

রায়। তারপর এখন কি উপায় করিবে?

রূপ। সেই জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি। এখন উপায় আপনি।

রায়। আমাকে কি ফৌজদারের সহিত লড়াই করিতে বল?

রূপ। কেন বলিব না? আপনি আমাদের জমিদার, রাজা, রক্ষাকর্ত্তা। অন্য রাজা কে, কোথায় থাকে, তাহা জানি না। আমরা আপনাকেই রাজা ও রক্ষক বলিয়া জানি। আপনি না রক্ষা করিলে আমরা কোথায় দাঁড়াইব?

রায় মহাশয় নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন,— "সর্ব্বনাশ! তুমি কি পাগল হইয়াছ?"

রূপ। বিপদে পড়িলেই লোকে পাগল হয়।

রায়। কিন্তু আমি তো তোমার মত পাগল হই নাই? রাজার সঙ্গে লড়াই? কি সর্ব্বনাশ! রামচন্দ্র!

রূপ। আপনাকে আমি রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিতে বলিতেছি না। কেবল অত্যাচারের বিরুদ্ধে—অধর্ম্মের বিরুদ্ধে আপনাকে দাঁড়াইতে বলিতেছি।

রায়। সে একই কথা। রাজা আর রাজার লোক দুইই এক।

রূপ। একই কথা নয়। যে রাজা প্রজাপালক, সে পূজ্য ; কিন্তু যে অত্যাচারী, প্রজাপীড়ক, সে ঘৃণার্হ।

রায়। রাজা মাত্রেই পূজ্য। বুড়া বয়সে কেন আমাকে আর জ্বালাতন কর ?

রূপনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"তবে কি অত্যাচার দমনের কোনই উপায় নাই ?"

রায় মহাশয় উর্দ্ধে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"উপায় ভগবান।"

রূপ। বুঝিয়াছি, এ বিপদ হইতে আমাদের আর উদ্ধার নাই। জানি না আমাদের মারিয়া ভগবানের কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

রায়। তুমি কি বলিতে চাও যে, তুমি খুন করিয়া আসিয়াছ, আর সে জন্য আমি শূলে যাইব, ইহাই ভগবানের ন্যায় বিচার ?

রূপনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—"আমি আমার জন্য বলিতেছি না। আমি খুন করিয়াছি,শূলে যাইতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু সেই অভাগিনীর—যাহার জন্য এই বিপদ উপস্থিত, সেই হতভাগিনীর কি রক্ষার কোন উপায় নাই ?"

রায় মহাশয় বদন বিনত করিলেন। রূপনাথ বলিলেন,

—"আপনি তাহার ভার গ্রহণ করুন, আমি ফৌজদারের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে চলিলাম।"

রায় মহাশয় মুখ তুলিলেন; দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"কি করিব ঠাকুর! আর সে দিন নাই। বাঙ্গালীর বাহু এখন দুর্ব্বল।"

রূপনাথ গর্জ্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"মিথ্যা কথা; বাঙ্গালীর বাহু দুর্ব্বল নহে, বাঙ্গালীর হৃদয় দুর্ব্বল; বাঙ্গালী শক্তিহীন নহে, বাঙ্গালী সাহসহীন; বাঙ্গালা ক্ষমতাশূন্য নহে, বাঙ্গালী একতাশূন্য।"

রায় মহাশয় নীরব হইলেন। রূপনাথ বলিতে লাগিলেন,—"আপনি আর্য্যসন্তান, আপনি সতীত্বের মর্য্যাদা জানেন। সেই জন্যই আবার বলিতেছি, সেই বিপন্না অবলার কি হইবে? যাহাদিগের মাতা, কন্যা, স্ত্রী হাসিতে হাসিতে জলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া সতীত্বের গৌরব প্রদর্শন করে, সেই আর্য্যসন্তানদিগের সম্মুখে একজন বিধর্ম্মী আসিয়া অবলার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবে,—পিশাচের পদতলে সতীর সতীত্ব বিদলিত হইবে, কিন্তু একজন আর্য্যসন্তানও কি সাহস করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবে না? সতীত্ব-গৌরব-প্রদীপ্ত এত বড় বাঙ্গালার মধ্যে কেহই কি তাহাকে আশ্রয় দিবে না?"

"আমি দিব" এক সৌম্যদর্শন যুবক সেখানে প্রবেশ করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"আমি দিব।"

সকলেই সবিস্ময়ে যুবকের দিকে চাহিলেন। রূপনাথ গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন,—"শঙ্কর! তুমি রাজ্যেশ্বর হও।"

রায় মহাশয় একবার শঙ্করের তেজোগর্ব্বসমুজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিলেন। তারপর রূপনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে। যাও ঠাকুর, তোমার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিলাম।"

রূপনাথ, শঙ্কর ও রায় মহাশয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে প্রস্থান করিলেন। সভাভঙ্গ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:•:—

শঙ্কর।

রণজিৎ রায় তৎপ্রদেশের মধ্যে একজন বিপুল বিত্তশালী প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার। তাঁহার সুবিস্তৃত জমিদারী; অমোঘ প্রতাপ, বিশাল বৈভব; সুবৃহৎ প্রাসাদ, প্রাসাদে পরিজন, দাসদাসী, কর্ম্মচারী প্রভৃতির সংখ্যা নাই বলিলেই হয়। প্রাসাদদ্বারে ভীমকায় সশস্ত্র প্রহরীদল দিবারাত্র পাহারা দিতেছে। সর্ব্বত্রই যেন ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার চিহ্ন সকল ফুটিয়া উঠিতেছে। ফল কথা, আজিকালিকার মহারাজ উপাধি-ধারী ধনিদিগের গৃহে যেরূপ ঐশ্বর্য্য চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, তাৎকালীন রাজা উপাধিবিহীন জমিদার রণজিৎ রায়ের গৃহে তদপেক্ষা অনেক অধিক বৈভবলক্ষণসমূহ বিরাজিত ছিল। বিশেষতঃ আধুনিক জমিদারগণের সহিত তৎসাময়িক জমি-দারদিগের তুলনাই হইতে পারে না। কারণ সে সময়ে জমিদারগণ নাম মাত্র অধীন হইলেও তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা সুখ উপভোগ করিতেন। রাজা কেবল তাঁহা-দিগের নিকট হইতে বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট করগ্রহণ করিতেন মাত্র;

তদ্ব্যতীত তাঁহারা আর কোনরূপে রাজার অধীন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেন না। রাজ্যের আয় ব্যয় বৃদ্ধি, প্রজাশাসন, বিচারকার্য্য প্রভৃতি বিষয়ে জমিদারগণই প্রায় সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তৃত্ব করিতেন। স্থানে স্থানে শাসনাদি কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা বা ফৌজদার থাকিতেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই নানাবিধ কারণে তাঁহারাও প্রায় জমিদারদিগের করায়ত্ত হইয়া পড়িতেন। এই সকল জমিদারের অধীনে ন্যূনাধিক পরিমাণে সৈন্য থাকিত, সৈন্যানুরূপ কামান বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্রও থাকিত। তাঁহাদিগের অধিকৃত বা সমীপবর্ত্তী কোন স্থানে বিদ্রোহাদি উপস্থিত হইলে তাঁহারা সেই সকল সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ লইয়া রাজসৈন্যের সহায়তা করিতেন। ইহা ভিন্ন তাঁহাদের পাইক নামধারী আর এক প্রকার সৈন্য থাকিত। এই পাইক সৈন্য কি, তাহা পরে বলিব। ফল কথা, তাৎকালীন জমিদারগণ স্ব স্ব অধিকৃত প্রদেশে সম্রাট্ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন সম্মান লাভ করিতেন না। লোকে তাঁহাদিগকে রাজা বলিয়া জানিত, এবং রাজা বলিয়াই ডাকিত। প্রথাটা আজিও চলিয়া আসিতেছে—এখনও অনেক স্থানে জমিদারগণ সাধারণের নিকট রাজা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

তবে সে সময়ে যে জমিদারগণ কোন অসুবিধাই ভোগ করিতেন না, এরূপ নহে। তখন এরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকায় সুবাদারের ইচ্ছানুসারে জমিদারী বিলি হইত। যথাসময়ে খাজানার টাকা না পৌঁছিলে অথবা অন্য কোন কারণে সুবাদার বিশেষ রুষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই জমিদারিস্বত্ব প্রদান করিতেন। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জমিদার, তাঁহারা দৈবক্রমে খাজানার টাকা যথাসময়ে দিতে না পারিলে সুবাদার বা ফৌজদারের হস্তে অশেষরূপে নির্য্যাতিত হইতেন। তাঁহাদিগকে বৈকুণ্ঠ নামক এক ভীষণ যন্ত্রণাময় স্থানে আবদ্ধ রাখিয়া টাকা আদায় করা হইত *। তবে যাঁহারা উপহারাদি দানে সুবাদার বা ফৌজদারগণকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিতেন, তাঁহাদের কোন ভয়ই ছিল না।

এরূপ ক্ষমতাশালী হইলেও রণজিৎ রায় যে প্রথমে রূপনাথ বা কমলাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কারণ ছিল। তিনি জানিতেন যে, এরূপ অবস্থায় রূপনাথকে আশ্রয় দেওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু এই কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই ফৌজদারের

---

* Riyazu-s-salatin.

বিষদৃষ্টিতে পড়িতে হইবে। ফৌজদার সহজে ছাড়িবে না। সে নিশ্চয়ই সৈন্য সজ্জা করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবে। তখন একটা খণ্ডযুদ্ধ বাধিবে। সে যুদ্ধে আপাতত তাঁহার জয়ের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিলেও পরিণামে ফল অতি ভয়ঙ্কর হইবে। পরাজিত অবমানিত ফৌজদার কখনই অল্পে ছাড়িয়া দিবে না। সে পুনঃ পুনঃ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিবে। শেষে ফৌজদারের কৌশলে এই ঘটনার সংবাদ অতিরঞ্জিত ভাবে সুবাদারের কর্ণগোচর হইবে। এমন কি, এ সংবাদ দিল্লী পর্য্যন্তও যাইতে পারে। তখন অসংখ্য মোগল সৈন্য আসিয়া জমিদারী ছাইয়া ফেলিবে, দেশ ছারখারে যাইবে। কাণ্ডজ্ঞানহীন ফৌজদারের রোষদৃষ্টিতে পড়িয়া তাঁহাকে জমিদারীর সহিত ভস্মীভূত হইতে হইবে।

এইরূপ পরিণাম চিন্তা করিয়াই প্রবীণ রণজিৎ রায় রূপনাথকে অভয় দিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। তবে তিনি যে এই ব্রাহ্মণ দম্পতীকে ফৌজদারের ক্রুদ্ধকবলে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন, তাহা নহে। তৎকালে হিন্দু সমাজের মধ্যে এরূপ পাষণ্ডের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল, বিশেষতঃ ধর্ম্মভীত প্রবীণ জমিদারদিগের মধ্যে। তিনি অর্থাদি প্রদানে বা অন্য কোন কৌশলে এই বিপন্ন ব্রাহ্মণের রক্ষার উপায় করিবেন, স্থির করিতেছিলেন। কিন্তু

তাহা হইল না। তখন নিয়তির উদ্দাম স্রোত আর এক বিভিন্ন পথে ধাবিত হইতেছিল; সে স্রোতের প্রবল বেগ তাঁহাকে প্রবাহমুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে ভাসাইয়া লইয়া ছুটিল; ঘটনার কর্ম্মময় চক্র বিভিন্ন দিকে ঘুরিয়া পড়িল। সে চক্রের নিয়ন্তা শঙ্কর—ইচ্ছা নিয়তির।

শঙ্কর, রণজিতের ভ্রাতুষ্পুত্র। রণজিৎ রায় অতুল বৈভব-শালী হইলেও সংসারের চরম সৌভাগ্য পুত্রমুখদর্শনে বঞ্চিত। এজন্য অনেক যাগযজ্ঞ, দানধ্যানাদির অনুষ্ঠান হইল। কিন্তু কোনরূপেই অদৃষ্টের দৃঢ়রুদ্ধ অর্গল মুক্ত হইল না। রণজিৎ পুত্রলাভে বঞ্চিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপীনাথ পরলোকগত হইলেন; তাঁহার সাধ্বী পত্নী তিন মাসের শিশুপুত্র শঙ্করকে রণজিতের স্ত্রীর ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া স্বামীর সহিত চিতারোহণ করিলেন। শোকাতুর রণজিৎ ভ্রাতৃশোক বিস্মৃত হইবার জন্য সেই ক্ষুদ্র শিশুকে বুকে তুলিয়া লইলেন। পুত্রহীন দম্পতীর সন্তপ্ত হৃদয় কিয়ৎ পরিমাণে স্নিগ্ধ হইল। তাঁহারা মাতৃপিতৃহীন এই শিশুটীর উপর সমস্ত হৃদয়ের ভালবাসা ও স্নেহ ঢালিয়া তাহাকে সযত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন। শঙ্করের মুখ দেখিয়া তাঁহাদের অপত্যশূন্য হৃদয়ের ক্ষোভ ক্রমে অন্তর্হিত হইল। ক্রমে শঙ্কর সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের পুত্রের স্থান অধিকার

করিল। শেষে তাঁহারা যে অপুত্রক, একথা সকলেই ভুলিয়া গেল, তাঁহারাও ভুলিলেন।

এইরূপে দুইটী স্নেহ ও ভালবাসার শান্ত তরঙ্গগুলির উপর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে শঙ্কর অষ্টাদশবর্ষ বয়সে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার রূপ, তাঁহার গুণ, তাঁহার কার্য্য দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইল। সকলেই রণজিতের অবর্ত্তমানে তাঁহাকে এই সুবিশাল জমিদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারী বলিয়া বুঝিল; বুঝিয়া সকলে আনন্দিত হইল। শঙ্কর বৃদ্ধগণের নিকট বিনয়নম্র বালক, দরিদ্রের সম্মুখে করুণাময় দেবতা, প্রজাগণের নিকট সর্ব্বগুণান্বিত সৌম্যদর্শন অধিপতি। এহেন শঙ্করকে দেখিয়া কে না মুগ্ধ হইবে? রণজিতের আর আনন্দের সীমা রহিল না। শঙ্করের হস্তে জমিদারীর ভার অর্পণ করিয়া সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন, স্থির করিলেন, কিন্তু শঙ্করকে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার স্নেহমুগ্ধ হৃদয় কাতর হইল। তিনি আজি কালি করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

অনেক গুণ থাকিলেও দোষের মধ্যে শঙ্কর একটু বেশী আব্দারে। বাল্যকাল হইতেই তিনি যাহা ধরিয়াছেন, তাহা না করিয়া ছাড়েন নাই। যখন যে সাধ করিয়াছেন, স্নেহবিহ্বল জ্যেষ্ঠতাত হাসিতে হাসিতে তাহাই পূরণ করিয়া-

ছেন। এখন বয়স হইলেও তাঁহার সে দোষটুকু যায় নাই। আর রণজিৎ সেটাকে দোষ বলিয়াই মনে করিতেন না। তিনি ভাবিতেন, তাঁহার শঙ্কর—এমন সোণার ছেলে শঙ্কর যদি আব্দারে না হইবে, তবে আর কে হইবে? কিন্তু তখন বৃদ্ধ জানিতেন না যে, একদিন এই আব্দারের জন্যই তাঁহাকে এক অচিন্তিত-পূর্ব্ব ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে; জানিয়া শুনিয়া ক্রুদ্ধ বিষধরের সম্মুখে হস্ত প্রসারণ করিতে হইবে।

শঙ্কর সভামধ্যে আসিয়া যখন রূপনাথকে বলিলেন,—"আমি আশ্রয় দিব" তখন রণজিৎ আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনি শঙ্করের প্রতিজ্ঞা জানিতেন। তথাপি একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। সে মুখে দৃঢ়তার—বীরত্বের অপূর্ব্ব বিভা দর্শন করিয়া চমকিত হইলেন, সেই সাহসিকতা—সেই শক্তি দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, সেই আশ্রিত-বাৎসল্য—সেই করুণা দেখিয়া বৃদ্ধ মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কোন কথা বলিলেন না বা বলিতে পারিলেন না। একেই রূপনাথের জ্বালাময় উদ্দীপনাপূর্ণ বাক্য শুনিয়া তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল, তাহার উপর শঙ্করের—তাঁহার স্নেহ-পালিত শঙ্করের সেই গর্ব্বস্ফীত বদনমণ্ডল, সেই প্রতিজ্ঞা,

সেই নির্ভীকতা দেখিয়া বৃদ্ধের শান্ত অবসন্ন হৃদয়ও গর্ব্বে নাচিয়া উঠিল; খর সৌর-করসম্পাতে ক্ষীণা চন্দ্রকলা প্রোজ্জ্বল হইল, মারুত সংযোগে প্রধূমিত বহ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তখন ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া, মনে মনে একবার ভগবানকে ডাকিয়া ব্রাহ্মণকে অভয় দিলেন। পরিণাম চিন্তার আর অবসর রহিল না। এইরূপেই ভবিষ্যৎ-অন্ধ মানব নিয়তি-চালিত হইয়া বিশাল কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে। তখন কে বলিতে পারে, সে ভবিষ্যতে উন্নতি বা অবনতিকে আলিঙ্গন করিবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—o:):*:(:o—

আয়োজন।

রুস্তম আলি যখন দেখিলেন যে, তাঁহার অকর্ম্মণ্য সিপাহী গুলা সেই কাফের বা হোরী দুইয়ের একটাকেও ধরিতে না পারিয়া রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি সবলে আপনার বিরল শ্মশ্রুরাজি আকর্ষণ করিতে করিতে, তাহারা যে এখনও কেন জাহান্নমে যায় নাই, তজ্জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আর আক্ষেপের সীমা রহিল না। তিনি ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া দূতীকে ডাকাই-লেন। দূতী তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইল। রুস্তম আলি চক্ষু পাকাইয়া তাহাকে কমলার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহার অনবধানতাই যে এই অনর্থের হেতু, তাহা ব্যক্ত করিয়া তাহাকে কঠোর শাস্তির ভয় দেখাইলেন। দূতী ভয়ে ভয়ে স্বামীর সহিত কমলার পলায়ন সংবাদ জ্ঞাপন করিল। রুস্তম আলি ধমক্ দিয়া কোন্ গ্রামে কমলার শ্বশুরবাড়ী, তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। দূতী দেবীগড়ার

কথা বলিল। দূতীকে বিদায় দিয়া রস্তম আলি তৎক্ষণাৎ দেবীগড়ায় বিশ্বস্ত চর প্রেরণ করিলেন। পরদিন চর ফিরিয়া আসিয়া যথাযথ সংবাদ জানাইল, এবং সেই দুরন্ত কাফেরটাকে জমিদার রণজিৎ রায় যে আশ্রয় দিয়াছেন, তাহাও বলিল। ক্রোধে ক্ষোভে গুম্ফ দংশন করিতে করিতে রস্তম আলি জমিদারীর সহিত বুড়া জমিদারটাকে সত্ত্ব জাহান্নমে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইলেন। তৎক্ষণাৎ পরওয়ানা সহ এক দূত, রণজিৎ রায়ের নিকট প্রেরিত হইল। পরওয়ানায় লিখিত হইল;—"রণজিৎ রায় অবিলম্বে অপরাধী কাফেরটাকে তাহার স্ত্রীর সহিত বন্দী করিয়া ফৌজদার সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।"

পরওয়ানা পাঠ করিয়া রণজিৎ রায় কিছু মাত্র বিস্মিত হইলেন না; তিনি এরূপ পরওয়ানার প্রত্যাশা করিতেছিলেন। নিকটে শঙ্কর বসিয়াছিলেন, তিনি জ্যেষ্ঠতাতের হস্ত হইতে পরওয়ানা খানা লইয়া পাঠ করিলেন। পাঠান্তে সেটাকে পদদলিত করিলেন। রণজিৎ, দূতকে বলিলেন,—"সে ব্রাহ্মণ অপরাধী হইলেও আমার আশ্রিত। আমি তাহার পরিবর্ত্তে ফৌজদার সাহেবকে দুই সহস্র মুদ্রা নজর দিতেছি, তাহা লইয়া তিনি ব্রাহ্মণকে ক্ষমা করুন।"

দূত গিয়া সমস্ত কথা রস্তম আলির গোচর করিল।

শুনিয়া রুস্তম আলি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। সাধ্য হইলে তিনি সে ক্রোধাগ্নিতে দেবীগড়া গ্রামটাকে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত করিতেন। কিন্তু অধুনা তাহার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া অন্তরে অন্তরে ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন, এবং অচিরেই রণজিৎ রায়ের জমিদারীটাকে শঙ্খেশ্বরীর গর্ভে ডুবাইবার ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইলেন। তিন শত সৈন্যকে সজ্জিত হইবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আর একখানা পরওয়ানা রণজিৎ রায়ের নিকট প্রেরিত হইল। পরওয়ানায় লিখিলেন,—"রণজিৎ রায় অপরাধীকে আশ্রয় দিয়া রাজ-বিধির অমর্য্যাদা করিয়াছেন, অতএব তিনি দণ্ডার্হ। কিন্তু এখনও যদি তিনি ফৌজদার সাহেবের আদেশ প্রতিপালন করেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে। নতুবা তাঁহার ন্যায় অবাধ্য জমিদারকে শাসন করিবার জন্য শীঘ্রই কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইবে। ফৌজদার সাহেব সত্বর সসৈন্যে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

রুস্তম আলি ভাবিলেন, এই পরওয়ানা পাইয়া বৃদ্ধ জমিদার নিশ্চয়ই ভীত হইবে, এবং তাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য করিবে। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, তাঁহার এ পরওয়ানার মর্য্যাদাও রক্ষিত হইল না, অধিকন্তু শুনিলেন যে, তাঁহার প্রেরিত পরওয়ানা শঙ্করের পদতলে মর্দ্দিত হইয়াছে, তখন

শীকারভ্রষ্ট শ্বাপদের ন্যায় ক্রুদ্ধ রস্তম আলি এই বৃদ্ধ জমিদারকে শাসিত করিবার অভিপ্রায়ে তিনশত সুসজ্জিত সৈন্য লইয়া সদলবলে দেবীগড়া যাত্রা করিলেন।

এদিকে পরওয়ানার মর্ম্ম বুঝিয়া রণজিৎ রায়ও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনিও আত্মরক্ষার্থ সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্কর মহোৎসাহে সে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। সে কালের জমিদার-তনয়েরা বাল্যকাল হইতেই যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত হইত। শঙ্করও অস্ত্র চালনায় এবং যুদ্ধ কৌশলে রীতিমত পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রায় দুইশত সৈন্য ও তদুপযোগী অস্ত্র সংগৃহীত হইল। শঙ্কর তাহাদের নেতা হইলেন। এতদ্ব্যতীত জমিদারীর ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে শতাধিক পাইক সৈন্য সংগৃহীত হইল। লাঠী ও বর্শা চালনায় অভ্যস্ত ডোম, বাগ্দী প্রভৃতি নীচজাতীয় লোকেরা পাইক নামে অভিহিত হইত। লাঠী খেলায় ইহারা সিদ্ধহস্ত এবং ইহাই তাহাদের এক প্রকার জীবিকা ছিল। সন্নিকৃষ্ট যুদ্ধে ইহারা বিশেষ ক্ষমতা ও কৌশল প্রদর্শন করিত। ইহাদের লাঠীর সম্মুখে সৈনিকের তরবারী কিছুই করিতে পারিত না। তৎকালে প্রায় সর্ব্বত্রই ধনিগণ ইহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। পূজা বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে ইহারা আপনাদিগের লাঠী চালনার কৌশল প্রদর্শন করিয়া ধনি-

দিগের নিকট হইতে প্রচুর পুরস্কার লাভ করিত। তখন ধনিগণ আদরের সহিত এই সকল নীচজাতীয় ব্যক্তির লাঠিখেলা দর্শন করিতেন এবং সন্তুষ্ট চিত্তে ইহাদিগকে পুরস্কৃত করিয়া উৎসাহ প্রদান করিতেন। ইহারাও তাহাতে উৎসাহিত হইয়া সযত্নে লাঠিখেলা শিক্ষা করিত এবং তাহার উন্নতি বিধানে যত্নশীল হইত। কালে আমরা সভ্য হইয়া এই অসভ্যজনোচিত ক্রীড়াকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম। ইহারাও উৎসাহ না পাইয়া লাঠিখেলা ত্যাগ করিল। ক্রমে খেলার সহিত লাঠীও দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইল। এখনও কোন কোন স্থানে এই খেলার অল্প প্রচলন আছে বটে, কিন্তু তাহাও অতি কষ্টে পূর্ব্ব-গৌরবের একটু স্মৃতি বজায় রাখিয়াছে মাত্র।

রূপনাথ স্বয়ং লাঠী চালনায় সিদ্ধহস্ত। তিনি এই পাইক সৈন্যের নেতা হইবেন, স্থির করিয়া রাখিলেন।

এত যে হইয়াছে, তাহা কমলা জানে নাই। রূপনাথ তাহাকে বলা আবশ্যক বোধ করেন নাই। কিন্তু যখন যুদ্ধোদ্যোগ গ্রামে রাষ্ট্র হইল, তখন কমলাও ইহা শুনিল। শুনিয়া তাহার বড় ভয় ও ভাবনা হইল। সে রূপনাথকে বলিল,—"কেন এ সর্ব্বনাশের আয়োজন করিলে?"

রূপনাথ হাসিয়া বলিলেন,—"সর্ব্বনাশ কি কমলা?"

কমলা বলিল,—"শুনিতেছি, আমাদের জন্য ফৌজদারের সহিত রণজিৎ রায়ের লড়াই হইবে ?"

রূপনাথ বলিলেন,—"হাঁ।"

কমলা বলিল,—"কেন এমন কাজ করিলে ? আমাদের জন্য ইহারা কেন ধনে প্রাণে মারা যাইবেন ?"

রূপনাথ একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"ভগবানের যদি সেইরূপই ইচ্ছা হয়, তবে তাহাই হইবে। তুমি আমি তাহার কি করিতে পারি কমলা ?"

কমলা বলিল,—"কিছুই কি পারি না ?"

রূপ। ফৌজদারের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে পারি।

কমলা। তাহা ছাড়া কি অন্য উপায় নাই ?

রূপ। না।

কমলা। উপায় আছে।

রূপনাথ সে উপায় বুঝিলেন; বলিলেন,—"না কমলা, এখন সে উপায়কে মনেও স্থান দিও না। তাহা হইলে এই ভীষণ অত্যাচারের প্রতিরোধ হইবে না। তবে আমাদিগকে একদিন মরিতেই হইবে—একদিন এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে; কিন্তু সে এখন নয়।"

কমলা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"কবে ?"

রূপনাথ বলিলেন,—"সময় হইলে বলিব।"

কমলা আর কিছু বলিল না। রূপনাথ ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেলেন। তখন কমলা উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া করযোড়ে গদ্গদ কণ্ঠে বলিল,—"ঠাকুর! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। স্বামীর মুখে শুনিয়াছি, আমরা কিছুই নয়, নিমিত্ত মাত্র। তথাপি অগ্রেই আমার কর্ত্তব্য আমি করিতে পারিতাম; কিন্তু আমার দেবতার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিব না। জানি না এই উভয় কর্ত্তব্যের মধ্যে কোন্‌টা বড়। আমাকে ক্ষমা করিও দয়াময়!"

অশ্রুধারায় কমলার গণ্ডদ্বয় প্লাবিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—— ০:):০:(:০ ——

দীক্ষা।

একদিন প্রভাতে সুপ্তোত্থিত গ্রামবাসিগণ সভয়ে দেখিল, অদূরে গ্রামের প্রান্তভাগে বিস্তৃত প্রান্তরে ফৌজদারের বাহিনী আসিয়া সমবেত হইয়াছে। তাহাদের সম্মুখে পত্ পত্ শব্দে মহম্মদীয় কেতন উড়িতেছে, সিপাহীগণের কটিবদ্ধ অসিকোষে প্রভাত-সূর্য্যকিরণ পড়িয়াছে, নবীনালোকে বন্দুকের অগ্রভাগ ঝলসিতেছে। গ্রামের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠার রোল পড়িয়া গেল; গৃহস্থগণ সভয়ে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিল, পথিক পথ ছাড়িয়া পলাইল, বণিক বিপনীদ্বারে চাবী লাগাইল। সর্ব্বত্রই একটা আশঙ্কার ছায়া নাচিতে লাগিল।

শঙ্কর বহুপূর্ব্বেই এ সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। তিনিও সুসজ্জিত সৈন্যগণকে লইয়া সিপাহীদের গ্রাম প্রবেশের পূর্ব্বেই তাহাদের গতি প্রতিরোধার্থ অগ্রসর হইলেন। যাত্রা-কালে জ্যেষ্ঠতাতকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। রণজিৎ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, স্নেহাশ্রু-

ধারে তাঁহার মস্তক সিঞ্চিত করিতে করিতে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। তারপর শঙ্কর রূপনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বলিলেন,—"ঠাকুর! যুদ্ধে চলিলাম, আশীর্ব্বাদ করুন।"

রূপনাথ সহাস্যে বলিলেন,—"যুদ্ধে যাও, কিন্তু আশীর্ব্বাদের আকাঙ্ক্ষা করিও না শঙ্কর!"

শঙ্কর সবিস্ময়ে রূপনাথের মুখের দিকে চাহিলেন। রূপনাথ বলিলেন,—"বিস্মিত হইও না। জান না কি, এ যুদ্ধ কোন দেশজয়ের আশায়, কোন রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় নহে। ইহা কেবল, অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্য, অত্যাচার দমনের জন্য। তবে ইহার মধ্যে জয় পরাজয়ের—লাভালাভের আশা কেন শঙ্কর?"

শঙ্কর বলিলেন,—"একি বলিতেছেন ঠাকুর?"

রূপনাথ বলিলেন,—"যাহা সত্য, যাহা ন্যায়, যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই বলিতেছি। তবে শুন শঙ্কর! বহুদিন পূর্ব্বে আর একবার এই ভারতে অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্য, অত্যাচার দমনের জন্য ভারতপ্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্র সমর সংঘটিত হইয়াছিল। সে যুদ্ধেও আশা-বিকলচিত্ত অর্জ্জুনকে অন্যায়ের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করাইবার জন্য এক মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন,—"নিরাশী র্নির্ম্মমো ভূত্বা যুদ্ধস্ব বিগতজ্বরঃ।" আজি

বহুদিন পরে আমিও সেই মহাবাক্যের পুনরুক্তি করিয়া বলিতেছি, শঙ্কর! জয় পরাজয়ের আশা ত্যাগ করিয়া কেবল অত্যাচার দমনই আপনার কর্ত্তব্যব্রতরূপে গ্রহণ কর।"

শঙ্কর বলিলেন,—"কঠোর ব্রত।"

রূপনাথ বলিলেন,—"অতি কঠোর। কিন্তু কঠোর ব্রতানুষ্ঠান ব্যতীত দুষ্কর সিদ্ধিলাভ করা যায় না। যদি বঙ্গের এই ভীষণ অত্যাচার-স্রোত প্রতিরুদ্ধ করিতে চাও,—যদি দেশের এই ঘোর হাহাকার নিবারণ করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে অগ্রে স্বার্থ চিন্তা পরিহার কর। এখন অত্যাচার দমন তোমার লক্ষ্য, যুদ্ধ তোমার কার্য্য।"

শঙ্কর। আর বিধর্ম্মী-প্রপীড়িত দেশ?

রূপ। কে বিধর্ম্মী শঙ্কর? দেশের উপর অত্যাচার অধর্ম্ম,—তদ্বিপরীতই ধর্ম্ম। অত্যাচারের দমন কর, তখন আর ধর্ম্মাধর্ম্মের ভেদ থাকিবে না। এই মহাকার্য্য সাধন করিবার জন্য অগ্রসর হও,—আপনার কর্ত্তব্য পালন কর। জয় পরাজয়ে তোমার অধিকার কি শঙ্কর?

শঙ্কর। কিছুই নাই?

রূপ। কিছুই নাই। একবার সেই মহাপুরুষের অমর-কণ্ঠ-ধ্বনিত সুপবিত্র গীতি স্মরণ কর,—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" আমাদের কর্ত্তব্য সাধন করিতে আমরা বাধ্য, জয় পরাজয়ে আমাদের কি শঙ্কর?

সহসা যেন শঙ্করের নবচক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি ব্রাহ্মণের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন,—"এতদিন এ মহা উপদেশ পাই নাই কেন ঠাকুর?"

রূপনাথ শঙ্করের হস্তধারণ করিয়া তাঁহাকে উত্তোলন করিলেন। বলিলেন,—"কার্য্য কালই শিক্ষার প্রকৃত অবসর, কার্য্যই প্রধান শি[illegible]। চল শঙ্কর! এখন আমরা সেই মহান্ কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই।"

শঙ্কর সবিস্ময়ে বলিলেন,—"আপনি কোথায় যাইবেন?"

রূপনাথ সহাস্যে বলিলেন,—"যুদ্ধে।"

শঙ্কর। যুদ্ধে?

রূপ। কেন শঙ্কর, ব্রাহ্মণের হৃদয়ে কি শক্তি নাই? ব্রাহ্মণের বাহু কি এতই দুর্ব্বল?

শঙ্কর। কিন্তু শাস্ত্রবলেই ব্রাহ্মণ চির শক্তিমান্।

রূপ। না শঙ্কর, সে শাস্ত্রবলের যুগ গত হইয়াছে। এখন আর তাহার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। এখন একবার শাস্ত্রবল ছাড়িয়া শস্ত্রবলের উপর নির্ভর করিতে হইবে। এখন একবার দেখাইতে হইবে যে, ব্রাহ্মণের অলৌকিক শক্তি কেবল শাস্ত্রের গূঢ় রহস্যোদ্ঘাটনেই পর্য্যাপ্ত নহে, তাহা শস্ত্রচালনেও সুনিপুণ। হায় শঙ্কর, আর কতদিন বসিয়া বসিয়া দেশের এই দুর্দ্দশা দেখিব?

শঙ্কর আর কিছু বলিতে পারিলেন না, তাঁহার নেত্র প্রান্তে অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। তখন রূপনাথ সাদরে শঙ্করের হস্ত ধারণ করিয়া যুদ্ধাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আবার বুঝি বহুদিন পরে বঙ্গের কুরুক্ষেত্রে নরনারায়ণের আবির্ভাব হইল!/.

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

——(০:✱:০)——

বোধন।

বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তর। প্রান্তরের এক পার্শ্বে তিনশত সিপাহী শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বন্দুক হস্তে দণ্ডায়মান। রক্তিম সূর্য্য-কিরণ তাহাদের মুখের উপর পড়িয়াছে। তাহাদের পশ্চাতে অশ্বারোহণে রুস্তম আলি। অপর পার্শ্বে শঙ্কর-চালিত দুই শত সৈন্য অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অবস্থিত; তাহাদের মধ্যস্থলে অশ্বারোহী শঙ্কর। তাঁহার উৎসাহপূর্ণ গৌরব-স্ফীত বদন-মণ্ডলে বীরত্বের আভা স্ফুরিত হইতেছে। এই সৈন্যশ্রেণীর পশ্চাতে শতাধিক পাইক সৈন্য সুদীর্ঘ লাঠিহস্তে দণ্ডায়মান। তাহাদের অগ্রভাগে রূপনাথ। উভয় পক্ষই নীরব, সকলেই আক্রমণোৎসুক।

সহসা সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া রূপনাথ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—“ভাই সব, আজি আমরা স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য, সতীর সতীত্ব রক্ষার জন্য, হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য শত্রু-শোণিতে মা'র প্রথম উদ্বোধন করিতে আসিয়াছি; জীবন

দিয়া জীবন অপেক্ষা প্রিয়, বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা মনোহর জননী জন্মভূমির হাহাকার নিবারণ করিতে উদ্যত হইয়াছি। আজি হিন্দুর বড় সৌভাগ্য—আজি আমাদের বড় আনন্দের দিন। একবার সকলে মুক্তকণ্ঠে বল, 'জয় জগদীশ হরে'।"

অমনই আকাশ, প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া তিনশত কণ্ঠ হইতে শব্দ উঠিল, 'জয় জগদীশ হরে!' বিশাল প্রান্তর কম্পিত করিয়া সেই জয়ধ্বনি উন্মুক্ত গগনপথে ছুটিল। তাহার শেষ প্রতিধ্বনি দিগন্তে মিলাইতে না মিলাইতেই সিপাহীগণের হস্তস্থিত বন্দুক 'ড়ুড়ুম্ ড়ুড়ুম্' শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের বাহিনীও তাহার উত্তর দিল।

তারপর সেই অবিশ্রান্ত ড়ুড়ুম্ ড়ুড়ুম্ শব্দে আকাশ, প্রান্তর কম্পিত হইয়া উঠিল; ধূমে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইল, উভয় পক্ষেই অনেক লোক হতাহত হইতে লাগিল; কোলাহল ও আর্ত্তনাদে প্রান্তর পরিপূরিত হইল। ক্রমে উভয় পক্ষ, দূরতা ত্যাগ করিয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া পড়িল। তখন সকলে বন্দুক ছাড়িয়া অসি ধারণ করিল।

রূপনাথ এতক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এখন উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, লাঠী ঘুরাইয়া সেই অস্ত্রধারী সৈন্যশ্রেণী মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাইকগণও উচ্চ হুঙ্কার তুলিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল।

সেই উন্মত্ত সৈন্যশ্রেণী মধ্যে দাঁড়াইয়া রূপনাথ উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন,—"জয় জগদীশ হরে!" অমনই গগন বিদীর্ণ করিয়া তিনশত কণ্ঠে নিনাদিত হইল, "জয় জগদীশ হরে!"

রস্তম আলি প্রথমে পাইকগণের এই সাহস দেখিয়া একটু হাসিলেন। ভাবিলেন, এই অস্ত্রধারী সৈন্যের মধ্যে লাঠী কি করিবে? এখনই উহাদের ছিন্ন শিরগুলা সিপাহীদের পদতলে লুটাইবে। কিন্তু পরক্ষণেই যখন দেখিলেন যে, সেই অস্ত্রহীন কাফেরগুলার লাঠীর এক এক আঘাতে তাঁহার অস্ত্রধারী সিপাহীর মস্তক চূর্ণিত হইতেছে, তাহাদের হস্ত হইতে তরবারি খসিয়া পড়িতেছে, অকর্ম্মণ্য সিপাহীগুলা একে একে কাফেরের পাদমূলে লুণ্ঠিত হইতেছে, তখন তিনি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন; তাঁহার বিস্ময় ও আক্ষেপের সীমা রহিল না। হায় হায়, তুচ্ছ কাফেরগুলার বাঁশের লাঠীর এত ক্ষমতা? রস্তম আলি সকলের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ক্রোধে ক্ষোভে গুম্ফ দংশন করিতে লাগিলেন।

এদিকে পাইকগণ সেই সৈন্যশ্রেণী মধ্যে যেন উন্মত্ত ভাবে বিচরণ করিতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের কণ্ঠ হইতে নিনাদিত হইতে থাকিল, 'জয় জগদীশ হরে!' সে শব্দে সিপাহীগণ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের শিক্ষিতহস্তচালিত তীক্ষ্ণধার তরবারি পাইকগণের লাঠীতে

ঠেকিয়া ব্যর্থ হইল, কাহারও অঙ্গস্পর্শ করিতে পারিল না। সঙ্গে সঙ্গে সেই চক্রবৎ বিঘূর্ণিত লাঠী আসিয়া কাহারও মস্তকে, কাহারও হস্তে, কাহারও স্কন্ধে পড়িতে লাগিল। সে ভীষণ আঘাতে কোন সিপাহীর মাথা ফাটিল, কাহারও হাত ভাঙ্গিল, কাহারও বা স্কন্ধের অস্থি বিচূর্ণিত হইল। একটী মাত্র আঘাতেই পৃথিবীটা তাহাদের দৃষ্টিতে ঘুরিয়া উঠিল, তাহারা কাঁপিতে কাঁপিতে ভগ্নমূল পাদপবৎ ধরালুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তবে শিক্ষিত সিপাহীর তরবারী যে সর্ব্বত্র ব্যর্থ হইল, তাহা নহে। সে আঘাতেও অনেক পাইক পড়িল। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প।

অদূরে দাঁড়াইয়া রস্তম আলি এই ভীষণ লাঠীবাজী দেখিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, এই সর্ব্বনেশে লাঠীই আজি তাঁহার সর্ব্বনাশ করিল। হায় নির্ব্বাসিত লাঠি! আবার কি তুমি অস্ত্রশূন্য দুর্ভাগ্য বঙ্গে ফিরিয়া আসিবে না?

এইরূপে প্রায় একপ্রহর কাল যুদ্ধ চলিল। রক্তে প্রান্তর কর্দ্দমাক্ত হইল, হতাহতের দেহে রণস্থল পরিপূরিত হইয়া উঠিল। ক্রমে সিপাহীরা হীনবল হইয়া আসিল। তখনও রূপনাথের উৎসাহপূর্ণ কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইতেছে, 'জয় জগদীশ হরে!' ক্ষীণবল সিপাহীগণ আর সেই অপ্রতিহত তেজ সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা পাছু হটিল।

অমনই শঙ্করের বাহিনী দ্বিগুণ বিক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তথন পলায়নোন্মুখ সিপাহীরা যে যে দিকে পারিল, ছুটিয়া পলাইল। রুস্তম আলিও ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে ভগ্নহৃদয়ে তাহাদের অনুসরণ করিলেন। শঙ্করের বাহিনী সিপাহীদের পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছিল, শঙ্কর তাহাদের নিবারণ করিলেন।

প্রবল প্রতাপশালী ফৌজদার সাহেব হতাবশিষ্ট ত্রিশ মাত্র সৈন্য লইয়া ছিন্নলাঙ্গুল শৃগালের ন্যায় রাজনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন রূপনাথ সেই রুধির-কর্দ্দমিত রণস্থলে শবরাশির উপর দাঁড়াইয়া শোণিতরঞ্জিত শরীরে শঙ্করকে আলিঙ্গন করিতে করিতে উচ্চকণ্ঠে গাহিলেন,—'জয় জগদীশ হরে!' সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠে শঙ্করও গাহিলেন,—'জয় জগদীশ হরে!' আকাশ, প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া শত শত কণ্ঠ হইতে শব্দ উঠিল,—"জয় জগদীশ হরে!"

নব বোধন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রতিষ্ঠা।

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥"

গীতা। ৩।১৯

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ে প্রত্যাখ্যান।

শরতের প্রভাত,—বড় শান্ত, বড় মধুর, বড় সমুজ্জ্বল। আকাশ নীল, নির্ম্মল, মেঘশূন্য; প্রকৃতি সহাস্যবদনা; বৃক্ষচয় পরিস্কৃত, প্রমুদিত। দেবীগড়ার প্রান্তভাগ বিধৌত করিয়া স্বচ্ছসলিলা শঙ্খেশ্বরী প্রবাহিত হইতেছে; তাহার শান্ত সুনির্ম্মল সলিলরাশি প্রভাতালোকে সমুজ্জ্বল হইয়াছে, ধীর সমীরাঘাতে তাহাতে বীচিভঙ্গ হইতেছে, ক্ষুদ্র তরঙ্গশিরে রক্ত রবিকর জ্বলিতেছে। আর সেই প্রভাতালোকোদ্ভাসিতা শান্ত-বীচিবিক্ষেপশালিনী শঙ্খেশ্বরীর তীরে সেফালিকা বৃক্ষতলে অর্দ্ধস্ফুটন্ত পদ্মের ন্যায় একটী বালিকা অঞ্চল ভরিয়া সেফালিকা পুষ্প কুড়াইতেছে। তাহার ললাটপতিত অসংযত বঙ্কিম কেশগুচ্ছ প্রভাত-মন্দানিলে উড়িতেছে, পূর্ব্বাকাশ হইতে একটা অরুণিমা আসিয়া তাহার নিটোল কপোল স্পর্শ করিতেছে, দুই একটা বৃন্তচ্যুত সেফালিকা তাহার মাথায় গায়ে পড়িতেছে। একটা ভ্রমর আসিয়া পুষ্পপূর্ণ অঞ্চলের উপর বসিতেছে, একবার কপোলের নিকট উড়িয়া গুন্ গুন্

করিতেছে, আবার বালিকার হস্তসঞ্চালনে ভীত হইয়া, উড়িয়া গিয়া গাছের উপর একটী সেফালিকার মাঝে বসিতেছে। তাহার ভারে ক্ষীণবৃন্ত সেফালিকা বৃন্তচ্যুত হইয়া বালিকার মাথার উপর পড়িতেছে, অমনই ভ্রমর তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বালিকার অঞ্চলের নিকট ঘুরিতেছে। বালিকা আপন মনে অঞ্চল ভরিয়া রাশীকৃত ফুল সংগ্রহ করিতেছে। বালিকার পদতলে কেবল শঙ্খেশ্বরী অস্ফুটভাষায় প্রভাতী সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে মন্থর গমনে চলিয়াছে; আর তাহারই সেই মধুরাস্ফুটস্বরে স্বর মিশাইয়া বালিকা আপন মনে গুন্ গুন্ করিতেছে।

এমন সময় সহসা পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল,—"চন্দ্রা!"

বালিকা চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, পশ্চাতে শঙ্কর প্রেমবিহ্বল নয়নে তাহার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। বালিকা ব্যস্তভাবে অসংযত গাত্রাবরণ সংযত করিয়া লইল। তাড়াতাড়িতে কতকগুলা ফুল অঞ্চলচ্যুত হইল। বালিকা আবার সেগুলাকে একটী একটী করিয়া কুড়াইতে লাগিল। শঙ্কর সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—"আজি আর অন্য ফুল নাই কেন চন্দ্রা?"

চন্দ্রা মুখ না তুলিয়াই উত্তর দিল,—"আমি আর অন্য ফুল তুলিতে যাইব না।"

শঙ্কর। কেন?

চ। বাবা বারণ করিয়াছেন।

শ। কি জন্য বারণ করিয়াছেন?

চ। জানি না।

শ। তোমার বাবা এখনও কি তোমায় মারেন?

চন্দ্রা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া অঞ্চলের ফুলগুলা বাঁধিতে লাগিল। বাঁধা শেষ হইলে একবার মুখ তুলিয়া শঙ্করের মুখের দিকে চাহিল। তখনই আবার মুখ নামাইয়া লইয়া, একটু থামিয়া, একটু ভাবিয়া বলিল,—"তুমি আবার কেন আসিলে?"

শঙ্কর, বালিকার সেই ভীতিবিহ্বল মুখখানির দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কেন চন্দ্রা, আমাকে আসিতে কি তুমি নিষেধ কর?"

চন্দ্রা মুখ নামাইয়া বলিল,—"না।"

শ। তবে কেন আসিব না?

চ। তুমি আসিলে——

সব কথাটা চন্দ্রা বলিতে পারিল না, মুখে বাধিয়া গেল। শঙ্কর বলিলেন,—"আমি আসিলে কি চন্দ্রা?"

চন্দ্রা একটু ইতস্ততঃ করিয়া, একটা ঢোক গিলিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"তুমি আসিলে বাবা——"

এত করিয়াও চন্দ্রা কথাটা সমাপ্ত করিতে পারিল না। কিন্তু শঙ্কর সেই অসমাপ্ত কথাটার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন; বলিলেন,—"বুঝিয়াছি চন্দ্রা, আমি আসিলে তোমার বাবা বিরক্ত হন।"

চন্দ্রা সজল দৃষ্টিখানি তুলিয়া শঙ্করের মুখের উপর স্থাপিত করিল। শঙ্কর একটী ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"তবে আর আমি আসিব না চন্দ্রা।"

চন্দ্রা কিছুই বলিল না, কেবল তাহার নেত্রপ্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। শঙ্কর একহস্তে চন্দ্রার ক্ষুদ্র চিবুকখানি ধরিয়া অন্য হস্তে আপনার উত্তরীয়ের অঞ্চলে সেই অশ্রুবিন্দু মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন,—"ছিঃ কাঁদিও না।"

চন্দ্রা কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—"সত্যই কি তুমি আসিবে না?"

সে স্বর শঙ্করের হৃদয়ে বিঁধিল। বলিলেন,—"তুমি যদি আসিতে বল, তবে আসিব।"

চন্দ্রা বলিল,—"যদি না বলি?"

শঙ্কর বলিলেন,—"তাহা হইলে আর আসিব না।"

চন্দ্রা একপদ পিছাইয়া দাঁড়াইল। অকম্পিত স্বরে বলিল,—"তবে তুমি আর আসিও না।"

শঙ্কর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে চাহিলেন; চন্দ্রাও মুখ ফিরাইয়া স্থিরদৃষ্টিতে শঙ্খেশ্বরীর স্বচ্ছ তরঙ্গের

উপর অরুণ সূর্য্যকিরণের নৃত্য দেখিতে লাগিল। মাথার উপর অসীম নীলিমাসাগরে সাঁতার দিতে দিতে একটা পাখী করুণকণ্ঠে বুকভাঙ্গা চীৎকারে কাহাকে ডাকিতেছিল। ঠিক তাহারই নীচে একটী ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা আর একটী অষ্টাদশ বর্ষীয় তরুণ যুবক ভালবাসার কঠোরস্মৃতি হৃদয়ে চাপিয়া দুইটী বিভিন্ন পথের কল্পনা করিতেছিল। হাস্যমুখরা প্রকৃতি এই দুইটী ব্যথিত হৃদয়ের দিকে চাহিয়া চাহিয়া নীরবে নির্ম্মম হাসি হাসিতেছিল। আর সমস্তই নীরব, শান্ত, স্থির।

কিয়ৎক্ষণ এই ভাবেই কাটিল। তারপর শঙ্কর চন্দ্রার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন,—"তবে তাই হোক্ চন্দ্রা! আর আমি আসিব না।"

চন্দ্রা সে দিকে ফিরিয়া চাহিল না। শঙ্কর উভয় হস্তে বক্ষঃ চাপিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। চন্দ্রা দৃষ্টি ফিরাইয়া সে দিকে চাহিল। যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ চন্দ্রা অনিমিষলোচনে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর শঙ্কর দৃষ্টিপথের অতীত হইলে সে ধীরে ধীরে নদীগর্ভে নামিল; অঞ্চল মুক্ত করিয়া সঞ্চিত ফুলগুলা জলের উপর ঢালিয়া দিল। মৃদুতরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া ফুলগুলি গঙ্গেশ্বরীর বুকে ভাসিয়া চলিল, চন্দ্রা তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। এমন সময় কর্কশ কণ্ঠে কে ডাকিল,—"চন্দ্রা!"

চন্দ্রা ত্রস্তভাবে ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, অদূরে পিতার ক্রুদ্ধদৃষ্টি তাহার উপর অগ্নিবর্ষণ করিতেছে। সে তখন ধীরে ধীরে জল হইতে উপরে উঠিল, ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে পিতার নিকট আসিল। পিতা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"আবার আসিয়াছিল?"

চন্দ্রা নতমুখে বলিল,—"আর আসিবে না।"

পিতা দৃঢ়মুষ্টিতে কন্যার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—"হতভাগি! আবার তাহার সহিত কথা কহিতেছিলি? আমি না বারণ করিয়াছি?"

চন্দ্রা কোন উত্তর করিল না। তখন পিতা সবলে কন্যার হস্ত আকর্ষণ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন।

সম্মুখেই এক অট্টালিকা। তৎকালের ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি-গণের অট্টালিকা যেরূপ হইত, ইহা তদনুরূপই ছিল। সুতরাং ইহার আর সবিশেষ বর্ণনার আবশ্যক নাই। এই অট্টালিকার অধিকারী কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী। কৃষ্ণকান্তের পিতা নবাব সরকারে চাকরি করিয়া সামান্য অবস্থা হইতে বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার একমাত্র পুত্র এই বৈভবের অধিকারী। কৃষ্ণকান্ত লোকটী ভাল, সাধারণের দৃষ্টিতে নিরহঙ্কারী, বিনয়ী, পরোপকারী, উদারহৃদয়। কিন্তু লোকদৃষ্টির অন্তরালে,—তাঁহার সেই

সর্ব্বজন-প্রশংসিত গুণাবলীর অভ্যন্তরে আর একটী গুপ্তভাব লুক্কায়িত ছিল। তাহা প্রথমে কেহ দেখিতে পায় নাই, কিন্তু শেষে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল।

কৃষ্ণকান্ত স্বভাবতই কিছু মিতব্যয়ী। এজন্য তাঁহার বাটীতে লোকজনের সংখ্যা কিছু কম। পরিজনের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় দাসদাসী ব্যতীত তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী এবং কন্যা চন্দ্রা। চন্দ্রার বয়স যখন আট বৎসর, তখন সে মাতৃহীনা হইয়াছে। কৃষ্ণকান্ত এই প্রথমা স্ত্রীর অকাল-বিয়োগে এতদূর কাতর হইয়া পড়িলেন যে, এক বৎসর পর্য্যন্ত অনেকের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিলেন না। শেষে যখন তাঁহার শূন্য গৃহখানা অধিকারিণীর অভাবে খাঁ খাঁ করিয়া তাঁহার চিত্তে বিষম বৈরাগ্য উৎপাদন করিল, এবং ভবিষ্যতে পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডলোপ আশঙ্কায় তাঁহার পুন্নামনরকভীত হৃদয়টা হায় হায় করিয়া উঠিল, তখন তিনি দেখিয়া শুনিয়া একটী ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া বালিকার পাণিপীড়ন পূর্ব্বক তাহাকে সেই শূন্য ভবনে গৃহিণীর সম্মানিত পদে স্থাপন করিলেন। তা' তাঁহার সে কার্য্যটা যে নিতান্ত গর্হিত হইয়াছিল, তাহা নহে। কারণ তখনও তাঁহার বয়স চল্লিশের সীমা অতিক্রম করে নাই।

কৃষ্ণকান্তের এই নব গৃহিণী-পদাভিষিক্তা পত্নীর নাম

পার্ব্বতী। কৃষ্ণকান্ত দেখিয়া শুনিয়াই পার্ব্বতীকে অর্দ্ধাংশ-ভাগিনী করিয়াছিলেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে পার্ব্বতী সুন্দরী। বাস্তবিকই পার্ব্বতী সুন্দরী। যে সৌন্দর্য্যে জগতে তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হয়, যে সৌন্দর্য্যে সুন্দ-উপসুন্দ নিহত হয়, যে সৌন্দর্য্যশিখায় রোমবিজয়ী শত শত সিজার, শত শত আণ্টনি ভস্মীভূত হয়, পার্ব্বতীর দেহে সেই সৌন্দর্য্যের শিখা। তবে অনলটা কোথায় তা' ঠিক বলা যায় না; বুঝি বা নয়নে। তাহার দেহের বর্ণ বড় সুন্দর, বড় সমুজ্জ্বল; সেই দেহ-সরোবরে সতত সহস্র সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ উঠিতেছে, নামিতেছে। অঙ্গের গঠন, বড় সুললিত, বড় সুকুমার; প্রতি পদক্ষেপে তাহার সেই সুগঠিত কমনীয় দেহখানা যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে, আন্দোলিত রূপের গাছ হইতে যেন লাবণ্যের কমনীয় ফুল ঝরিতে থাকে। তাহার দৃষ্টি আবেশময়, বিলোলকটাক্ষ-পূর্ণ; সে কটাক্ষে একেবারে সহস্র বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠে। কণ্ঠস্বর মার্জ্জিত, মধুবর্ষী; সে স্বরে এককালে শত বীণার ঝঙ্কার উঠিয়া শ্রোতার হৃদয়কে মুগ্ধ ও বশীভূত করিয়া ফেলে। ফল কথা, পার্ব্বতী অসাধারণ রূপলাবণ্যময়ী। তাহার প্রতি অঙ্গে যেন সৌন্দর্য্যের তীব্র মাদকতা মিশ্রিত রহিয়াছে; প্রতি কার্য্যে, প্রতি পদক্ষেপে, প্রত্যেক ভাব ভঙ্গীতে সেই মাদকতার একটা বৈদ্যুতিক শক্তি দর্শককে

আকৃষ্ট ও অভিভূত করে। আর পার্ব্বতীর গুণ—সে গুণের বিস্তৃত পরিচয় দিতে আমরা অক্ষম। আমাদিগের অনেক দুর্ভাগ্য যে, তাহার পাপ চরিত্র চিত্রিত করিয়া লেখনীর সহিত আপনাকে কলুষিত করিতে হইতেছে। কিন্তু আলোক অন্ধকার লইয়াই সংসার; তাই আমাদেরও পার্ব্বতীচরিত্রের অবতারণা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

——০ঃ)ঃ০ঃ(ঃ০——

পার্ব্বতীর রাগ।

কৃষ্ণকান্ত একটা বিষয়ে রণজিৎ রায়ের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার এই বিপুল বৈভবের মূল কারণ রণজিৎ রায়। তাঁহারই চেষ্টায় ও সহায়তায় কৃষ্ণকান্তের পিতা নবাব সরকারে প্রবিষ্ট হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারই অনুরোধের বলে ক্রমে উচ্চপদাভিষিক্ত হইয়া এই সম্পত্তিরাশি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত রায় মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কৃষ্ণকান্তও রায় খুড়ার সহিত ঘনিষ্ঠতা ও বাধ্যবাধকতা রাখিয়া আসিতেছিলেন। শেষে কৃষ্ণকান্ত এই ঘনিষ্ঠতাকে আরও একটু আত্মীয়তা-সূত্রে বাঁধিয়া দৃঢ় করিবার জন্য রায় খুড়ার নিকট একটা প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সে প্রস্তাব—চন্দ্রার সহিত শঙ্করের শুভপরিণয়। রায় মহাশয় এ প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইবার কোনই হেতু দেখিতে পাইলেন না। তিনি সানন্দে এ প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। কিন্তু তখনও কথাটা বাহিরে অপ্রকাশ রহিল।

এ প্রস্তাবের অনেক পূর্ব্ব হইতেই চন্দ্রা ও শঙ্করের মধ্যে একটা প্রীতি বা ভালবাসার ভাব জন্মিয়াছিল। শঙ্কর ইচ্ছামত প্রায় সর্ব্বদাই কৃষ্ণকান্তের বাটীতে যাইতেন। তখন চন্দ্রার মাতা জীবিত ছিলেন। তিনি শঙ্করকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন। শঙ্করও তাঁহার সেই ভালবাসার মধ্যে কোমল মাতৃস্নেহের সুমিষ্ট আস্বাদ পাইতেন, এবং সেই আস্বাদের লোভে তথায় ছুটিয়া যাইতেন।

তারপর চন্দ্রার জননীর মৃত্যু, কৃষ্ণকান্তের দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ, পার্ব্বতীর শুভাগমন। কিন্তু এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যেও শঙ্করের যাতায়াত বন্ধ হয় নাই। বরং মাতৃহীনা চন্দ্রার জন্য তাঁহার যাতায়াতের মাত্রাটা আরও একটু বাড়িয়াছিল। চন্দ্রাকে দেখিবার বা আদর যত্ন করিবার কেহ নাই, তাহার কষ্টে আহা করিবার লোক নাই। কাজেই শঙ্কর, চন্দ্রার ভারটা আপনার স্কন্ধেই লইয়াছিলেন। আর চন্দ্রা? সে যে তাঁহাকে না দেখিলে থাকিতে পারিত না, তাঁহাকে না পাইলে হাসিত না, দিনান্তে একবারও দেখা না পাইলে সে কাঁদিয়া শয্যা ভাসাইত। সেই দ্বিতীয় অবলম্বনশূন্যা জ্ঞানহীনা বালিকাও অজ্ঞানাবস্থাতেই আপনার সমস্ত ভারটা শঙ্করের উপর ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহার পর ত্রয়োদশবর্ষীয়া পার্ব্বতী আসিয়া যখন এই শূন্য

ভবনে প্রবেশ করিল, তখন প্রথমে তাহার কেমন বাধ বাধ ঠেকিল। কথা কহিবার একটা লোক নাই, দেখিবার শুনিবার কেহ নাই। চন্দ্রা বালিকা, কৃষ্ণকান্ত বিষয় আশয়ের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত। পার্ব্বতীর বড় কষ্ট হইল; পুরীটা তাহার পক্ষে নির্জ্জন কারাগৃহ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তারপর সমবয়স্ক শঙ্করকে পাইয়া তাহার দেহে যেন প্রাণ আসিল। কথা কহিবার, হাসিবার, গল্প করিবার একটা লোক পাইয়া সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার দিন কাটাইবার একটা উপায় হইল। সেই নির্জ্জন স্তব্ধ পুরীমধ্যে যদি সে শঙ্করকে না পাইত, তবে বুঝি তাহার একটা দিনও কাটিত না।

শঙ্করকে পাইয়া পার্ব্বতী প্রথমে বড়ই আনন্দিত হইল। খেলা ধূলা, গল্প, হাস্য পরিহাসে নীরস দিনগুলা সুখেই কাটিয়া যাইতে লাগিল। তারপর শঙ্কর ধীরে ধীরে সপ্তদশ বর্ষে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার কিশোর-সুলভ লাবণ্যের উপর একটু একটু করিয়া তরুণ যৌবনের ছায়াপাত হইতে লাগিল। এদিকে পার্ব্বতীও তখন যৌবনের প্রথম সোপান অতিক্রম করিয়া ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিল; তাহার হৃদয়ে নিবিড়, উচ্ছল যৌবনের একটা বান ডাকিয়া গেল। যে বান নদীর উভয় কূল ভগ্ন করিয়া গ্রাম নগর প্লাবিত করিতে

করিতে প্রধাবিত হয়, পার্ব্বতীর হৃদয়-নদীতে সেইরূপই একটা জোর বান ডাকিল। সেই প্রবল বন্যার প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া পার্ব্বতী আর স্থির থাকিতে পারিল না।

এই সময় হইতেই পার্ব্বতীর হৃদয়ে যৌবন-সুলভ ভালবাসা বা প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। সে আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিবার জন্য তাহার উদাস প্রাণটা একবার চারিদিকে ছুটিল। কিন্তু কোনদিকেই কাম্য বস্তু না পাইয়া হতাশ ভাবে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। তাহাতে আকাঙ্ক্ষার আগুন আরও ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। রূপলাবণ্যময়ী পার্ব্বতী স্বামীর নিকট কোনদিনই প্রণয় বা ভালবাসার এতটুকুও কোমল আহ্বান শুনিতে পাইল না। তিনি আপনার বিষয় সম্পত্তি লইয়াই ব্যস্ত, প্রেমের ধার ধারিতেন না। কৃষ্ণকান্ত কেবল উপভোগের জন্যই রূপবতী পার্ব্বতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহা পাইলেন। পার্ব্বতীর সেই অনন্য-সাধারণ রূপের নিকট তিনি আপনাকে বিক্রীত করিলেন, সেই কমনীয় সৌন্দর্য্যের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া কেবল উপভোগ প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধন করিতে লাগিলেন। একবারও পার্ব্বতীর হৃদয়ের দিকে চাহিতে তাঁহার প্রবৃত্তি বা অবসর হইল না। তবে এ হেন উপভোগপরায়ণ স্বামীর স্ত্রী উপভোগের জন্য লালায়িত না হইবে কেন? পার্ব্বতীও

আপনার উপভোগ প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য চারিদিকে লালসাময়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তারপর সে ধীরে ধীরে পাপের পিচ্ছিল পথে গড়াইয়া পড়িল। পার্ব্বতী মরিবার জন্যই জন্মিয়াছিল, তাই সে মরিল। কিন্তু একটু দুঃখ, সে রোগে একটু ঔষধ পাইয়া মরিল না কেন?

পার্ব্বতী যখন হৃদয়ে ভালবাসার আগুন জ্বালাইয়া ইন্ধন খুঁজিতেছিল, তখন অন্য ইন্ধন না পাইয়া সম্মুখস্থ শঙ্করকেই জড়াইয়া ধরিল, সরলপ্রাণ শঙ্করকেই দগ্ধ করিবার জন্য তাহার হৃদয়-বহ্নি জ্বালাময় সহস্রশিখা বিস্তার করিল। কিন্তু শঙ্কর তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার সরল হৃদয়ে কোনরূপ সন্দেহের বা পাপের ছায়া মাত্র পড়িল না।

লালসাময়ী পার্ব্বতী বহুদিন আপনার হৃদয়ের আগুন চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সে এক দিন শঙ্করের পাদ-মূলে বসিয়া প্রেমভিখারিণীরূপে আপনার হৃদয়দ্বার খুলিয়া দিল, প্রেম-গদগদ স্বরে আপনার প্রাণের আবেগ ব্যক্ত করিয়া, তাঁহার নিকট প্রেমভিক্ষা করিল। সে কথা শঙ্করের কর্ণে শত বজ্রের ন্যায় বাজিল; তিনি ভয়ে বিস্ময়ে ঘৃণায় কাঁপিয়া উঠিলেন। তারপর পরুষকণ্ঠে পার্ব্বতীর সেই ভয়ঙ্কর প্রার্থনার প্রত্যাখ্যান করিলেন। পার্ব্বতী তখন শঙ্করের পাদমূলে লুটাইয়া তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা

করিল। শঙ্কর ক্রোধে পা টানিয়া লইয়া সেই বিষধরীর সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিলেন। পার্ব্বতীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুঃখে ক্রোধে, অনুতাপে লজ্জায় তাহার মরিতে ইচ্ছা হইল। ছিঃ ছিঃ, একটা ক্ষুদ্র বালক তাহার এই লোকদুর্ল্লভ সৌন্দর্য্যে পদাঘাত করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল? শঙ্করের উপর তাহার বড় রাগ হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মেঘোদয়।

অধিক দিন পার্ব্বতীর রাগ থাকিল না, সে সহজে শঙ্করের আশা ছাড়িতে পারিল না। আবার একবার শেষ চেষ্টা দেখিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু শঙ্কর আর এখন তথায় আসে না। তখন পার্ব্বতী লোক দ্বারা তাঁহাকে বারম্বার সাদরে আহ্বান করিল। এমন কি, কৃষ্ণকান্তও একদিন এজন্য শঙ্করের নিকট অনুযোগ করিলেন। চন্দ্রা যে তাঁহাকে না দেখিয়া কেবল কাঁদিতেছে, ইহাও বলিলেন। শুনিয়া শঙ্করের প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। কিন্তু পার্ব্বতীর সম্মুখে যাইতে তাঁহার সাহস হইল না। তবে কৃষ্ণকান্তের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে দুই একবার যাইতেন; বাহিরে বাহিরে চন্দ্রার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাহিরে বাহিরেই চলিয়া আসিতেন, পার্ব্বতীকে দেখা দিতেন না।

দেখিয়া শুনিয়া পার্ব্বতী হতাশ হইয়া পড়িল। সে

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে স্থির করিল, হতভাগিনী চন্দ্রাই তাহার সুখের পথে প্রধান কণ্টক। চন্দ্রার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াই শঙ্কর তাহাকে উপেক্ষা করিতে সাহসী হইয়াছে। তখন পার্ব্বতীর সমস্ত ক্রোধটা চন্দ্রার উপর পড়িল। সে ঠিক করিল, চন্দ্রাকে যন্ত্রণা দিয়া শঙ্করের হৃদয়ে শেল ফুটাইবে। অনেকের স্বভাব, শত্রুর কোন অনিষ্ট করিতে না পারিলে অন্ততঃ তাহার পোষা বিড়াল কুকুরটাকেও দুই চারি ঘা মারিয়া শোধ লইয়া থাকে। পার্ব্বতীও তাহার প্রবল শত্রু শঙ্করকে হাতে না পাইয়া চন্দ্রাকে মারিয়াই গায়ের রাগ মিটাইতে লাগিল। হতভাগিনী চন্দ্রার আর ক্লেশের সীমা রহিল না।

চন্দ্রা—মাতৃহীনা চন্দ্রা নীরবে বিমাতার কঠোর অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিল। সে আপনার কষ্টের কথা কাহাকেও বলিত না। আর বলিবেই বা কাহাকে? সংসারের একমাত্র আশ্রয় পিতা—তিনি তো বিমাতার রূপমুগ্ধ, ক্রীতদাস। কেবল বলিবার একজন আছে—শঙ্কর। কিন্তু তিনি এখন আর সর্ব্বদা আসেন না, কখন আসিলেও তাঁহাকে আপনার দুঃখের কথা বলিয়া ব্যথিত করিতে চন্দ্রার ইচ্ছা হয় না। আর তাঁহাকে বলিলেই বা কি হইবে? অগত্যা মাতৃহীনা বালিকা নীরবে সমস্ত অত্যাচার সহিতে

লাগিল। কেবল যখন বড় কষ্ট হইত,তখন একবার শঙ্খেশ্বরীর তীরে সেই সেফালিকা তলায় গিয়া বসিত। একবার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইত, কিন্তু বিমাতার ভয়ে পারিত না। কেবল তাহার নীরব হৃদয় ফাটিয়া অজস্র অশ্রু-ধারা বক্ষঃ প্লাবিত করিত। তার পর শঙ্কর আসিয়া যখন তাহার সেই অশ্রুধারা সযত্নে মুছাইয়া দিতেন, তখন চন্দ্রা সকল অত্যাচার সকল ক্লেশ ভুলিয়া যাইত। শঙ্করের স্নেহ-পূর্ণ বুকে মাথা রাখিয়া বালিকা সান্ত্বনার যে মধুর স্বর শুনিত, তাহারই লোভে সে শঙ্খেশরীর কোমল আহ্বান উপেক্ষা করিত। কিন্তু তাহার এই সুখটুকু—এই শেষ সান্ত্বনাটুকুও স্থায়ী হইল না।

পার্ব্বতী কেবল সহিষ্ণু চন্দ্রার উপর অত্যাচার করিয়াই তৃপ্তি পাইল না। সে শঙ্করের এই দুর্ব্ব্যবহারের ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ লইবার সঙ্কল্প করিল। প্রেমভিখারিণী পার্ব্বতী উপেক্ষিতা হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। সে যখন কিছুতেই শঙ্করকে আপনার বশে আনিতে পারিল না, তখন তাহার পদাহত হৃদয়ে প্রতিহিংসার করাল বহ্নিশিখা ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিল। সে অগ্নিতে শঙ্করকে দগ্ধ করিতে না পারিলে তাহার আর শান্তি নাই। সে কিরূপে শঙ্করের সর্ব্বনাশ করিবে, কি উপায়ে এই নির্ব্বোধ গর্ব্বিত বালককে উপযুক্ত

শিক্ষা দিবে, এখন কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিল। কিন্তু তাহা তাহার সাধ্যাতীত। সম্পদে, বিক্রমে, গৌরবে, সর্ব্ব-বিষয়েই শঙ্কর তাহার হাতের বাহিরে। সে শঙ্করের অপেক্ষা আপনাকে অনেক নিম্নে দেখিল। রোষে, দুঃখে, অপমানে, তাহার হৃদয় জ্বলিতে লাগিল। তখন পার্ব্বতী আর এক সর্ব্বনাশকর উপায়ের উদ্ভাবনে প্রবৃত্তা হইল।

চতুরা পার্ব্বতীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্বামীর হৃদয় মধ্যে একটু রন্ধ্র দেখিতে পাইল। সে সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়া আপনার প্রণয়যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদানের সঙ্কল্প করিল। কৃষ্ণকান্ত ধনে মানে গৌরবান্বিত হইলেও তাঁহার হৃদয়ের এক নিভৃত প্রদেশে একটী ঈর্ষ্যাজড়িত আকাঙ্ক্ষার বীজ অতি গোপনে একপাশে পড়িয়াছিল। তাঁহার ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু তাহা রণজিৎরায়ের সমতুল্য নহে; সম্মান আছে, কিন্তু তাহা রণজিতের সম্মানের নিকট অতি তুচ্ছ; খ্যাতি আছে, কিন্তু তাহা এই প্রতাপশালী জমিদার হইতে অতি নগণ্য। রণজিৎ রায় দেশের রাজা, তিনি একজন প্রজামাত্র। তবে আর কৃষ্ণকান্তের ঐশ্বর্য্য, সম্মান, খ্যাতির গৌরব রহিল কোথায়? প্রখর সূর্য্যকিরণের মধ্যে খদ্যোতের ক্ষীণজ্যোতি কে গণনা করে? হায়, এই গৌরবসূর্য্য কি কোন দিনই উঠিবে না? কৃষ্ণকান্ত ভাবিতেন উঠিবে না, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

অসম্ভব বোধেই কৃষ্ণকান্ত মনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন। কিন্তু বীজটুকু নষ্ট হয় নাই, কেবল জলসেচনের অভাবে এত দিন তাহা বাড়িতে পারে নাই। এখন পার্ব্বতী সেই ক্ষুদ্র অদৃশ্যপ্রায় বীজটুকুর মূলে নিত্য নিয়মিত রূপে জলসেচন করিতে আরম্ভ করিল। অভিমান ও অনুযোগের সুরে সর্ব্বদাই স্বামীর কর্ণে বিষমন্ত্র ঢালিতে লাগিল। কৃষ্ণকান্ত প্রথমে কথাটায় তত আস্থা স্থাপন করেন নাই। কিন্তু নিয়ত শুনিতে শুনিতে কথাটা তাঁহার হৃদয়ের সেই ছিদ্রে গিয়া বাজিতে লাগিল। তখন আর তিনি রূপলাবণ্যময়ী পার্ব্বতীর সোহাগের অনুরোধটাকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে সাহস করিলেন না। পার্ব্বতীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কৃষ্ণকান্তের হৃদয়নিহিত বীজটী তখন অঙ্কুরিত হইয়াছে।

ঠিক এই সময় ফৌজদারের সহিত রণজিৎ রায়ের বিরোধ বাধিল। পার্ব্বতী স্বামীকে বুঝাইল, এই উপযুক্ত অবসর। কৃষ্ণকান্তও তাহা বুঝিলেন। তিনি সর্ব্বগ্রাসী লোভের তাড়নায় এই বিস্তৃত জমিদারীটীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন। রণজিৎ রায়ের পদে আপনাকে বসাইয়া পার্ব্বতীকে কৃতার্থ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। পার্ব্বতীর মন্ত্রণায় তিনি ফৌজদারের সহিত আনুগত্য করিয়া রণজিৎ রায়ের সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কয়েকবার

গোপনে গিয়া ফৌজদারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন বাঙ্গালার ভাগ্যগগনে ধীরে ধীরে একখণ্ড কালমেঘ সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

তখন পার্ব্বতী তাঁহাকে বুঝাইল যে, এখন রণজিতের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংস্রব ত্যাগ করিতে হইবে। নতুবা ফৌজদারের কৃপালাভ অসম্ভব। কৃষ্ণকান্তও তাহা বুঝিলেন। তিনি অল্পে অল্পে রায় খুড়ার সহিত সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় হইতেই শঙ্করের সহিত চন্দ্রার দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হইল। এতদিন পরে শঙ্কর হৃদয়ে একটা আঘাত পাইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

——০ঃ)ঃ*ঃ(ঃ০——

কর্ম্ম কাহার ?

সন্ধ্যার অনতিকাল পরে রণজিৎরায়ের প্রাসাদ সমীপস্থ বিশাই দীঘির ঘাটের চাতালের উপর বসিয়া রূপনাথ একটা সেতারের কাণ মোচ্ড়াইতেছিলেন। পার্শ্বে শঙ্কর নীরবে বসিয়াছিলেন। ঘাটের উপর বিশালাক্ষী দেবীর সুউচ্চ মন্দির। নির্ম্মল মেঘশূন্য আকাশে দশমীর চন্দ্র হাসিতেছিল। তাহার রজত কিরণরেখা তুষারধবল দেবীমন্দিরের উপর পড়িয়াছিল। সম্মুখে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকার জল গভীর, শান্ত, সুনির্ম্মল, স্বচ্ছস্ফটিকবৎ। নৈশমন্দানিলে তাহাতে এক একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিতেছিল; শুভ্র কৌমুদীরশ্মি তাহার উপর হীরকচূর্ণ বিক্ষিপ্ত করিতেছিল। ক্ষুদ্র উর্ম্মিমালা সোপান প্রান্তে প্রহত হইয়া এক অস্ফুট আরাব তুলিতেছিল। সেই অস্ফুটারাব-শব্দিত জ্যোৎস্না-প্লাবিত চাতালের উপর বসিয়া রূপনাথ সেতার বাঁধিতেছিলেন।

সেতার বাঁধা শেষ হইলে রূপনাথ তাহাতে অঙ্গুলি

রূ। ইহাই সেই বাজিকরের মেয়ের খেলা—ইহাই ভ্রান্তি। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥"

আমরা যে অহঙ্কার-বিমুগ্ধ জীব শঙ্কর।

শ। কিন্তু এই অহঙ্কারকে কি ত্যাগ করা যায় না? এ সমস্ত কি ভুলা যায় না?

ঠিক্ এই কথাটাই কয়দিন হইতে তাঁহার মনে জাগিতে-ছিল। যে দিন হইতে চন্দ্রা তাঁহাকে বলিয়াছিল, 'আর আসিও না' সেই দিন হইতেই শঙ্কর ভাবিতেছিলেন, ভুলা কি যায় না? তাই আজি তিনি সুযোগ বুঝিয়া প্রশ্ন করি-লেন,—"ভুলা কি যায় না?"

তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া রূপনাথ ঈষৎ হাসিলেন। বলিলেন, —"ভুলা যায়।"

শ। কিরূপে?

রূ। যাঁর কর্ম্ম, তাঁর হস্তেই কর্ম্মের শুভাশুভ ফল অর্পণ করিয়া কর্ম্ম করিয়া যাও।

শ। তাহা হইলে কর্ম্ম করিবারই বা আবশ্যক কি?

রূ। আবশ্যক সম্পূর্ণ। তুমি সংসারী জীব, প্রতি মুহূর্ত্তেই তোমাকে কর্ম্মের সুদৃঢ় গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে,

প্রতি নিশ্বাসে তুমি কর্ম্মের আবশ্যকতা অনুভব করিবে। কিন্তু যদি সেই সুদৃঢ় গণ্ডী ভেদ করিতে চাও, তবে ফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কেবল কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করিতে থাক, লাভালাভের সহিত আপনাকে জড়িত করিও না।

শ। তাহা আরও কঠিন। আমি কোন কর্ম্মই করিব না।

ঠা। উত্তম, কিন্তু আকাঙ্ক্ষাকে দূর করিতে পারিবে না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।

রসবর্জ্জ্যং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥"

কর্ম্ম না করিলেও এই বাসনা কোথায় যাইবে? তখন বাহিরে কর্ম্মহীন, কিন্তু ভিতরে কর্ম্মের অদম্য বাসনা। সে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"বাহ্যেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

তাই বলিতেছি শঙ্কর, কর্ম্ম কর, কিন্তু বাসনা পরিহার কর। একবারে হইবে না, অভ্যাস কর।

শ। অভ্যাসে ভুলা যায় কি?

ঠা। ক্রমে যায়।

শ। কিন্তু ঠাকুর, ভুলিতে যে ইচ্ছা হয় না; প্রাণ যে কাঁদিয়া উঠে?

রূ। ইহাই সেই বাজীকরের মেয়ের খেলা।

শ। তবে কি হইবে ঠাকুর?

রূ। চেষ্টা কর। চেষ্টায় অসাধ্যও সুসাধ্য হয়।

ক্ষণকাল উভয়েই নীরব। শঙ্কর নীরবে দীর্ঘিকার মৃদু তরঙ্গমালার দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিলেন,—"ভুলিতে কি পারিব না?" তরঙ্গমালা সোপানপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িয়া যেন উত্তর দিল, "না না।" আকাশ পানে চাহিলেন। উদার অনন্ত আকাশ, অনন্তের বক্ষে অনন্ত নক্ষত্রমালা। শঙ্কর সেই নক্ষত্রমালার দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিলেন,—"ভুলা কি যায় না?" সেই অনন্ত গগনপ্রান্ত হইতে অনন্ত নক্ষত্রকণ্ঠে যেন সমস্বরে প্রতিধ্বনিত হইল,—"না না।" দূরে জ্যোৎস্না-পুলকিত বিশাল প্রান্তর। সেই বিস্তৃত মুক্ত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিলেন,—"তবে কি ভুলিব না?" সেই বিশাল প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া একটা ক্ষুদ্র পক্ষী যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া করুণ চীৎকারে বলিল,—"না গো না, না গো না।" তখন চতুর্দ্দিক হইতে যেন সহস্র কণ্ঠের প্রতিধ্বনি আসিয়া তাঁহার কর্ণে বাজিতে লাগিল, "না না না।" শঙ্কর স্তম্ভিতভাবে নীরবে বসিয়া রহিলেন।

সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া রূপনাথ বলিলেন,—"শুনিতেছি ফৌজদার সাহেব আবার সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে।

দুইবারের পরাজয়েও তাহার শিক্ষা হয় নাই। এবার আয়োজনটা কিছু বেশী রকম।

শঙ্কর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"সে জন্য আমরাও প্রস্তুত আছি। কিন্তু—"

রূ। কিন্তু কি শঙ্কর?

শ। কিন্তু আর কেন ঠাকুর?

দুই বিন্দু অশ্রু শঙ্করের গণ্ডে গড়াইয়া পড়িল। রূপনাথ স্নেহকণ্ঠে বলিলেন,—"ছিঃ শঙ্কর, আমি কি অপাত্রে শিক্ষার বীজ বপন করিলাম?"

তখন শঙ্কর রূপনাথের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"ঠাকুর, আমাকে রক্ষা করুন।"

রূপনাথ শঙ্করের হাত ধরিয়া তুলিলেন। স্নেহকোমল কণ্ঠে বলিলেন,—"ভয় কি শঙ্কর, মাকে ডাক। মা আমার বড় দয়াময়ী।"

শঙ্কর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিলেন,—"মা! মা!"

রূপনাথ আবার সেতারটা তুলিয়া লইয়া ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠে গাহিলেন —

একবার ডাক্ দেখি মন মা মা বলে,
দেখি কেমনে মা থাকে ভুলে।
যখন ছেলের ডাকে বাজবে বুকে পাষাণীর প্রাণ যাবে গলে।

ভক্তির সুরে প্রাণটী বেঁধে,

ডাক্ দেখি মন, কেঁদে কেঁদে,

খ্যাপা মেয়ে সেধে সেধে অভয় কোলে লবে তুলে।

গানের শেষ তরঙ্গ নৈশসমীরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া যখন স্থির হইল, তখন এক দীর্ঘকায় মুসলমান আসিয়া তাঁহাদিগকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। উভয়ে সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—০ঃ)ঃ*ঃ(ঃ০—

দেশত্যাগ।

একবার পরাজিত হইয়াই যে রস্তম আলি নিরস্ত হইলেন তাহা নহে। বরং এই পরাজয়ে প্রতিশোধ কামনার সহিত জেদের মাত্রাটা আরও বাড়িয়া উঠিল। কিছুদিন পরে তিনি আবার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রণজিৎ রায়কে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু আবার পূর্ব্ববৎ বাধা পাইয়া স্বস্থানে ফিরিতে বাধ্য হইলেন। তখন তিনি বুঝিলেন, ব্যাপারটা বড় সামান্য নহে। কিন্তু অসামান্য হইলেও ইহার একটা প্রতিবিধান করিতেই হইবে। নতুবা জগদ্বিখ্যাত মোগল নামে কলঙ্ক-স্পর্শ করিবে। ভারত-বিজয়ী মোগলের রাজত্বে এতবড় একটা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া, শক্তিশালী মুসলমানরক্ত দেহে ধারণ করিয়া একটা হীনবীর্য্য কাফেরের নিকট আপনার উন্নত মস্তক নত করা অপেক্ষা লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? রস্তম আলি তেমন লজ্জিত ধিক্কৃত জীবনভার অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন। এখন

কমলার সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে ; তৎপরিবর্ত্তে তথায় এখন প্রতিহিংসার জ্বালাময় পিপাসা জাগিয়া উঠিয়াছে। তিনি কিরূপে রণজিৎরায়-কৃত এই অপমানের প্রতিশোধ লইয়া আপনার বিজয় পতাকা উড্ডীন করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

অনেক ভাবিয়াও রস্তম আলি কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। একবার মনে করিলেন, সুবাদারের নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভাবিলেন, বাঙ্গালার একটা সামান্য কাফের জমিদারের হস্তে তিনি নিগৃহীত হইয়াছেন,এ সংবাদ শুনিয়া সুবাদার সাহেব কি মনে করিবেন ? তিনি কি তাঁহাকে কার্য্যের অযোগ্য মুসলমান-কুলকলঙ্ক স্থির করিয়া রুষ্ট হইবেন না ? তাঁহার পার্ষদগণ কি কঠোর বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া তাঁহাকে মর্ম্মাহত করিবে না ? বিশেষতঃ যদি কোনরূপে এ বিবাদের মূলকারণটা বাহির হইয়া পড়ে ? রস্তম আলি কোন মতেই সুবাদারকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিতে সাহস করিলেন না। তিনি স্বকীয় ক্ষমতা দ্বারাই ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। হঠাৎ একটা উপায় তাঁহার মাথায় আসিল। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার এই কাফের সিপাহীগুলা একবারেই অকর্ম্মণ্য ; তাহাদের বুকে সাহস নাই, কব্জীতে জোর নাই,

হৃদয়ে দৃঢ়তা নাই। তাহাদের সঙ্গে পড়িয়া তাঁহার মুসলমান সিপাহীগুলাও ক্রমে অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। অতঃপর এই কাফেরগুলার পরিবর্ত্তে মুসলমান সিপাহী নিযুক্ত করাই উচিত। সমবেত মোগলশক্তির নিকট তুচ্ছ বাঙ্গালীর শক্তি নিশ্চয়ই পরাভূত হইবে।

যেমন সংকল্প, তেমনই কার্য্য। অচিরেই হিন্দুসিপাহীগণ সৈনিক পদ হইতে বিতাড়িত হইল এবং নানাস্থান হইতে মুসলমান সিপাহী আসিয়া তাহাদের স্থান পূর্ণ করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে একটা বড় গোল বাধিল। সিপাহীগণ বেতনের পরিবর্ত্তে জমি ভোগ করিত। এই জমির আয়ই তাহাদের জীবিকা ছিল। এক্ষণে কার্য্যচ্যুত হইয়া তাহাদিগকে সেই সকল জমি ছাড়িতে হইল। কিন্তু এই বহুকাল-ভোগ্য সম্পত্তির মায়া সহসা কেহ ত্যাগ করিতে পারিল না। অনেকের বাসভবনও এই জমির অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহারা সহজে বাসচ্যুত হইতে সম্মত হইল না। তাহারা সকলে ফৌজদার সাহেবের নিকট কাঁদিয়া পড়িল। কিন্তু ফৌজদার সাহেব তাহাদের ক্রন্দনে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বলপূর্ব্বক সেই সকল ভূমি কাড়িয়া লইতে লাগিলেন। যাহারা সহজে ছাড়িলনা, তাহারা অশেষ প্রকারে নির্য্যাতিত হইল। ইহাতে সকলের মধ্যে একটা অসন্তোষের বীজ ছড়া-

ইয়া পড়িল। তাহার ফলে বাসচ্যুত ভূমিচ্যুত হিন্দুসিপাহী-গণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কিন্তু ফৌজদারের প্রভূত শক্তির নিকট সকলেই পরাজিত হইল। একেই রস্তম আলির মাথা ঠিক ছিল না, তাহার উপর এই ঘটনায় তাঁহার আর ক্রোধের সীমা রহিল না। তাঁহার সেই ক্রোধাগ্নিতে দেশটা ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হইল। তিনি দোষী নির্দ্দোষী বিচার না করিয়াই হিন্দু অধিবাসিগণের উপর ভীষণ অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। সেই অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী এস্থলে বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন। ফলতঃ সে অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া হিন্দুগণ হাহাকার করিতে করিতে দেশ ছাড়িয়া পলাইল। দেখিতে দেখিতে গ্রামখানা শ্মশানের আকার ধারণ করিল। রস্তম আলি চতুর্দ্দিক হইতে মুসলমান প্রজা আনাইয়া গ্রামে স্থাপন করিতে লাগিলেন।

একে একে যখন সকলেই চলিয়া গেল, তখন বাধ্য হইয়া কমলার মাতাও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যাই যাই করিয়াও তাঁহার দুই দিন কাটিয়া গেল। আবাল্য-পরিচিত শ্বশুরের ভিটা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কিছুতেই তাঁহার মন সরিতেছিল না, কিন্তু একে একে যখন সকল হিন্দুই দেশত্যাগ করিল, তখন তিনি একা আর সেখানে কিরূপে থাকেন। অগত্যা তাঁহাকে বাস্তুভিটার মায়া কাটাইতে

হইল। সমস্ত জীবনের সুখদুঃখ-বিজড়িত গৃহ, আসবাব জিনিষ পত্র সকলই পড়িয়া রহিল। কেবল তিনি একা এক দিন মধ্যাহ্নকালে বসুমাতাকে প্রণাম করিয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে গৃহত্যাগ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে বহুকালের স্মৃতি-জড়িত বাড়ীখানা পড়িয়া রহিল।

বৃদ্ধা প্রথমে একজন লোক সঙ্গে লইবেন ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু তখন গ্রামে কয়েক ঘর মুসলমান ব্যতীত আর কেহ ছিল না। যে দুই একঘর হিন্দু ছিল, তাহারাও তখন পলায়-নের জন্য ব্যস্ত। সে অবস্থায় কে তাঁহার সঙ্গে যাইবে? অগত্যা একাই তিনি দেবীগড়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জামাই বাটীতে বাস লজ্জাকর মনে হইলেও এক্ষণে তাঁহার আর দ্বিতীয় আশ্রয় ছিলনা। অগত্যা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে দেবীগড়াতেই যাইতে হইল। ভাবিলেন, কয়েকদিন জামাই বাটীতে থাকিয়া তারপর কাশীবাসের ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহার সঞ্চিত কিছু টাকা ছিল, তাহা পেটের কাপড়ে উত্তম রূপে বাঁধিয়া লইলেন।

বৃদ্ধা একাদশ বর্ষ বয়সে শ্বশুরবাটীতে প্রবেশ করা অবধি কখনও গ্রামের বাহিরে পা দেন নাই। কাজেই দেবীগড়ার পথ তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। কিন্তু তিনি ভাবিলেন, লোকে জিজ্ঞাসা করিয়া কত দেশে যায়, আমি এই মাঠটুকু

পার হইয়া দেবীগড়া যাইতে পারিব না? তাঁহার বিশ্বাস, এই বড় মাঠটার পরপারেই দেবীগড়া গ্রাম।

মধ্যাহ্নকালে বাটীর বাহির হইয়া বৃদ্ধা ভয়ে ভয়ে সশঙ্ক পাদক্ষেপে গ্রামটুকু পার হইলেন। গ্রামের পরই বিস্তৃত মাঠ। মাঠের বিস্তৃত বক্ষ ভেদ করিয়া চারিদিকে পথ চলিয়া গিয়াছে। ইহার কোন্ পথটা দেবীগড়ায় গিয়া ঠেকিয়াছে, তাহা তো বৃদ্ধা জানেন না। তিনি সেই খানে একটু দাঁড়াইলেন। তার পর মনে মনে ভগবানকে ডাকিয়া একটা পথ অবলম্বন করিলেন।

পথে জনপ্রাণী নাই। বৃদ্ধা ভয়ে ভয়ে সেই নির্জ্জন পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পথপার্শ্বে একটা বড় বটগাছের তলায় কয়েকজন মুসলমানকে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। তৎকালে পথে দস্যুভয় অত্যন্ত প্রবল ছিল। বৃদ্ধা তাহাদিগকে দেখিয়াই প্রথমে দস্যু বলিয়া মনে করিলেন। অমনই তাঁহার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন, গ্রামের এত নিকটে ফৌজদারের এত হাঙ্গামায় দিনের বেলা কি এখানে দস্যু থাকিতে পারে? বিশেষতঃ ইহাদের কাছে তেমন বড় বড় লাঠীও নাই। তখন বৃদ্ধা সাহসে নির্ভর করিয়া আরও একটু অগ্রসর হইলেন। তারপর সেই সমবেত ব্যক্তিগণের

সম্মুখস্থ হইয়াও যখন দেখিলেন, কেহই তাঁহাকে কিছু বলিল না বা তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না, তখন তাঁহার ভয়টা অনেক দূর হইল। তিনি সাহসে নির্ভর করিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ বাবা, এই কি দেবীগড়ার রাস্তা?"

একজন মুসলমান তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল,—"কোথায় যাবি বুড়ি?"

বৃদ্ধা সবিনয়ে বলিলেন,—"দেবীগড়া যাব। এইটাই কি দেবীগড়ার রাস্তা বাবা?"

মুসলমান বলিল,—"কোন্ দেবীগড়া?"

সর্ব্বনাশ! কোন্ দেবীগড়া, তাহাতো তিনি জানেন না। আরও যে দুই একটা দেবীগড়া আছে, তাহা কখন শুনেনও নাই। অগত্যা একটু ভাবিয়া বলিলেন,—"যে দেবীগড়ায় আমার জামাইবাড়ী।"

সকলে হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। প্রথম বক্তা বলিল,—"কে তোর জামাই?"

দলের মধ্য হইতে আর একজন বলিল,—"তোর জামায়ের নাম কি?"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"রূপনাথ চক্রবর্ত্তী।"

প্র·ব। তোর মেয়ের নাম কি?

বৃ। মেয়ের নামের সঙ্গে রাস্তার কি বাবা?"

প্র-ব। তা না শুন্‌লে ঠিক বল্‌বো কেমন করে? রূপনাথ চক্রবর্ত্তি কি আর কেউ নাই?

বৃদ্ধা বুঝিলেন, কথাটা ঠিক্। বলিলেন,—"আমার মেয়ের নাম কমলা।"

প্র-ব। কোন্ কমলা?

দ্বি-ব। ফৌজদার সাহেবের কম্‌লি বিবি?

বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"বাবা, বুড়ো মানুষকে কি রাস্তার মাঝে এমনই তামাসা কর্‌তে হয়। তা' তোমরা রাস্তা না বলে দাও, ভগবান্ বলে দেবেন।"

খিল্ খিল করিয়া হাসিয়া প্রথম বক্তা বলিল,—"বুড়ি, সোজা রাস্তা কি অমনি পাওয়া যায়? ফৌজদার সাহেবের কাছে চল্, সোজা পথ পাবি।"

বৃদ্ধা সভয়ে বলিলেন,—"কেন বাবা, ফৌজদারের কাছে কেন যাব বাবা? আমি কি করেছি?"

প্রথম বক্তা উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—"তোরই জামাই না পাঁচটা সেপাই মেরেছিল?"

বৃদ্ধা সভয়দৃষ্টিতে নীরবে তাহার দীর্ঘ শ্মশ্রুশোভিত ভীষণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বক্তা তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল,—"তোর মেয়েতো পালিয়েছে, এখন চল্ তুইই ফৌজদারকে নিকে করবি।"

বৃদ্ধা কাঁদিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"দোহাই বাবা, বুড়ো মানুষকে মেরো না বাবা, তোমাদের বুড়োপীরের দোহাই, আমাকে ছেড়ে দাও বাবা।"

কিন্তু চোরা শুনে না ধর্ম্মের কাহিনী। বৃদ্ধাকে কাঁদিতে দেখিয়া বক্তা আরও দ্বিগুণ বিক্রম প্রকাশ করিতে করিতে নিকটে আসিয়া বলিল,—"হারামজাদি, এখন তোর সে সেঠেল জামাই কোথা? সে কাফের আমার চাচাকে খুন করেছে। আজ তার শোধ নেব।"

বৃদ্ধাকে ধরিবার জন্য বক্তা হাত বাড়াইল; বৃদ্ধা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। সহসা সেই দলের মধ্য হইতে এক দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ মুসলমান যুবক লাফাইয়া বক্তার সম্মুখে পড়িল; এবং তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—"সেখের পো, একি কর? বুড়ীর উপর শোধ?"

প্রথম বক্তা হস্ত আকর্ষণ করিতে করিতে বলিল,—"শুধু বুড়ী কেন, সে কাফেরের আণ্ডাবাচ্চা যা পাব, তারই উপর শোধ নেব।"

যুবক বলিল,—"মরদ্ বাচ্চার কথা বটে। কিন্তু এই বুড়ীর গায়ে হাত দিতে পাবেনা।"

বক্তা সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"কেন?"

যুবক বলিল,—"আমার বাপ দাদা এই বুড়ীর খেয়ে মানুষ, আমার সাম্‌নে তার গায়ে হাত দেয়,এমন মরদ নাই।"

বক্তা গর্জ্জন করিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল,—"ভাল দেখা যাবে।"

তখন যুবক তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। তারপর বৃদ্ধার দিকে ফিরিয়া বলিল,— "ভয় নাই চাচি চল্, আমি তোর জামাইবাড়ী চিনি।"

বৃদ্ধা একবার ভাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। পরে হর্ষ-গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, —"আবদুল, তুই এখানে?"

আবদুল বলিল—"হাঁ, এখন বেলা যায় চল্।"

আনন্দে কৃতজ্ঞতায় বৃদ্ধার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে কৃতজ্ঞতার দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তিনি বাবা হরির নিকট, মা কালীর নিকট আব্-দুলের মঙ্গল কামনা করিতে করিতে নির্ভয়ে অগ্রসর হইলেন, আবদুল তাঁহার পশ্চাতে চলিল।

প্রথমোক্ত মুসলমান ডাকিয়া বলিল,—"ফোজদারের কাছে কিসে বাঁচবে, তার ঠিক করেছ? সেখানে কি জবাব-দিহি করবে?"

আবদুল একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল। স্থির কণ্ঠে

বলিল,—"সেখানে না করতে পারি, আল্লার কাছে এর জবাবদিহি করবো?"

বৃদ্ধার সহিত আবদুল চলিয়া গেল। সকলে সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কেহই তাহাকে ধরিতে সাহস করিল না। যে ব্যক্তি বৃদ্ধাকে ধরিতে অগ্রসর হইয়াছিল, সে ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলের ন্যায় সেই দিকে চাহিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিল,—"আচ্ছা, রহিম বক্স এর শোধ না নিয়ে ছাড়্‌বে না।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—০:):০:(:০—

ইন্ধন সংযোগ।

কমলার নাতাকে দেবীগড়ায় পৌছাইয়া দিয়া পরদিন প্রত্যুষে আবদুল যখন গৃহে ফিরিল, তখন সে সভয়ে সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার বাড়ীটা প্রকাণ্ড ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে। স্তম্ভিত হৃদয়ে আবদুল কিয়ৎকাল সেই ভস্মস্তূপের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর বৃদ্ধ পিতা, যুবতী পত্নী ও শিশুপুত্রের অন্বেষণ করিল। কিন্তু প্রতিবাসিগণের মুখে শুনিল যে, গতকল্য রাত্রিকালে ফৌজদার সাহেবের আদেশে তাহার পিতা, পত্নী এবং পুত্রকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া বাটীতে অগ্নি প্রদান করা হইয়াছে। তাহারা জীবন্তে দগ্ধ হইয়াছে। ফৌজদারের সিপাহীগণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া এই পৈশাচিক কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছে। ফৌজদারের ভয়ে কেহই বাধা দিতে বা বিপন্নগণকে উদ্ধার করিতে সাহসী হয় নাই।

আবদুল ফিরিয়া আসিয়া সেই ভস্মস্তূপের উপর একবার বসিল। তারপর ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ভস্মরাশির মধ্যে কি

অন্বেষণ করিতে লাগিল। তখনও ভস্মরাশি হইতে স্থানে স্থানে অগ্নির প্রচণ্ড উত্তাপ নির্গত হইতেছে। কিন্তু আবদুল তাহা গ্রাহ্য না করিয়া উন্মত্তবৎ তাহার মধ্যে কাহাকে খুঁজিতে লাগিল। বহুক্ষণ অন্বেষণের পর এক স্থানে কয়েক খান দগ্ধাবশিষ্ট অস্থি মিলিল। আবদুলের নয়নদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। সে একখণ্ড উত্তপ্ত কঙ্কাল হস্তে লইয়া ফৌজদারের গৃহাভিমুখে ছুটিল।

রস্তম আলি তখন দরবারে বসিয়া আবদুলের গৃহদাহ-কারীকে উপযুক্ত পুরস্কারে আপ্যায়িত করিতেছিলেন। এমন সময় আবদুল অর্দ্ধদগ্ধ কঙ্কাল হস্তে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। রস্তম আলি তাহার সেই উন্মাদমূর্ত্তি ঘূর্ণিত লোচনদ্বয় দেখিয়া বিচলিত হইলেন। তিনি ব্যস্ততাসহ তাহাকে ধরিবার জন্য উপস্থিত প্রহরীদ্বয়কে আদেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার আদেশের শেষ বাক্য উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই আবদুল হস্তস্থিত অস্থিখণ্ড দ্বারা সবলে তাঁহার মস্তকে আঘাত করিল। সে প্রচণ্ড আঘাতে তাঁহার শিরস্ত্রাণ দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং মস্তকের চর্ম্ম কাটিয়া দরদর রক্তধারা বহিল। রস্তম আলি চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেলেন। প্রহরীদ্বয় আবদুলকে ধরিতে গেল, কিন্তু তাহারাও প্রহৃত হইয়া পশ্চাৎপদ হইল। তখন আবদুল হস্তস্থিত সেই অস্থি-

খণ্ড ফৌজদার সাহেবের গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল। তাহার সেই রৌদ্রমূর্ত্তির সম্মুখে কেহই অগ্রসর হইতে সাহস করিল না।

তখন একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। অনেক লোকজন ছুটিয়া আসিল। সকলেই ফৌজদার সাহেবকে তুলিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। হাকিম আসিয়া মস্তকে ঔষধ-প্রয়োগ দ্বারা রক্তস্রাব বন্ধ করিলেন। মস্তকাবরণে বাধা পাওয়ায় আঘাতটা তত গুরুতর হয় নাই। কিছুক্ষণ পরেই রস্তম আলি সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন প্রহরীদ্বয়ের উপরেই তাঁহার ক্রোধের প্রথম বেগটা পড়িল। তাহাদিগকে বিবিধ সুমধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া পরে আবদুলকে ধরিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। তাহাকে কুত্তা দিয়া খাওয়াইবার হুকুম হইল। সিপাহীগণ আবদুলকে ধরিবার জন্য চারিদিকে ছুটিল। কিন্তু তখন আবদুলকে ধরা সহজ ব্যাপার নহে।

রস্তম আলির সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিয়া আবদুল প্রথমে উন্মাদের ন্যায় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছুটিয়া বেড়াইল। তারপর যখন শোকের প্রথম বেগটা একটু কমিয়া আসিল, মনটা একটু স্থির হইল, তখন সে দেবীগড়া অভিমুখে চলিল। অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যার পর দেবীগড়ায়

উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া সে প্রথমে রূপনাথকে খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু তাহাকে মুসলমান দেখিয়া কেহই তাহার কথা শুনিল না। আবদুল অনেক খুঁজিয়াও রূপনাথকে পাইল না। তখন ক্ষুধায় তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। সমস্ত দিনের মধ্যে সে জলবিন্দুও স্পর্শ করে নাই, স্পর্শ করিবার ইচ্ছাও হয় নাই। কিন্তু এতক্ষণে সে তৃষ্ণার প্রবল তাড়নায় জলের অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইল। খুঁজিতে খুঁজিতে বিশাই দীঘির স্বচ্ছ সলিলরাশি তাহার পিপাসিত দৃষ্টির সম্মুখে পড়িল। সে সাগ্রহে দীর্ঘিকায় নামিয়া আকণ্ঠ পূরিয়া শীতল জল পান করিল। পানান্তে আবদুল যখন তীরে উঠিল, তখন দীর্ঘিকার অপর পার হইতে একটা মধুর সুরতরঙ্গ আসিয়া তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তেমন সুর আবদুল আর কখনও শুনে নাই। সেই মোহন সুরে আকৃষ্ট হইয়া সে, যেখান হইতে সুরটা উঠিতেছিল, দীঘির পাহাড় দিয়া সেই দিকে চলিল। সেখানে গিয়া আবদুল সেই সঙ্গীতকারীকে দেখিল, পরিষ্কার জ্যোৎস্নালোকে তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল। সে সেইখানে দাঁড়াইয়া মুগ্ধহৃদয়ে সেই মধুময় সঙ্গীত শুনিতে লাগিল। গীতবিমুগ্ধ রূপনাথ বা শঙ্কর কেহই সে দিকে লক্ষ্য করেন নাই।

তারপর যখন সঙ্গীত থামিল, দিগন্ত হইতে সঙ্গীতের শেষ তরঙ্গ যখন মিলাইয়া যাইতে লাগিল, তখন আবদুল ধীরে ধীরে রূপনাথের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে সেলাম করিল। রূপনাথ ও শঙ্কর তাহাকে দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইলেন। পরে রূপনাথ জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তুমি? কি চাও?"

আবদুল বিনীতস্বরে বলিল,—"আমি একজন বিপন্ন মুসলমান; হুজুরের নিকট আশ্রয় চাই।"

রূপ। তোমার নাম কি? বাড়ী কোথায়?

আব। আমার নাম আবদুল খাঁ, রাজনগরে আমার বাড়ী ছিল।

রূপ। ছিল; এখন কোথায় বাড়ী?

আব। এখন কোথাও নাই।

রূপ। কেন?

আব। তাহাই জানাইবার জন্য হুজুরের নিকট আসিয়াছি।

রূপ। তোমার কি বিপদ?

আব। ফৌজদার সাহেব আমাকে কুত্তা দিয়া খাওয়াইবার আদেশ দিয়াছেন।

রূপনাথ ও শঙ্কর শিহরিয়া উঠিলেন। শঙ্কর বলিলেন,—"কেন, তোমার অপরাধ কি?"

আবদুল তখন কমলার মাতার আগমন হইতে পরবর্ত্তী সময়ের ঘটনা একে একে নিবেদন করিল। শুনিয়া উভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন। রূপনাথ বলিলেন,—"সামান্য অপরাধে ফৌজদার এত ভীষণ শাস্তির অনুষ্ঠান করিলেন কেন?"

আবদুল বলিল,—"তাহা ফৌজদারের খেয়াল। তা' ছাড়া আরও একটা কারণ আছে।"

রূপনাথ জিজ্ঞাসিলেন,—"কি কারণ?"

আবদুল বলিল,—"এখন মোগলের রাজত্ব, ফৌজদার সাহেবও মোগল। কিন্তু আমরা পাঠান। মোগলেরা পাঠানদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। সুযোগ পাইলেই তাহাদের উপর নানারূপ অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে উৎপীড়িত করে। রাজনগরে মুসলমান-বাসিন্দার মধ্যে সকলেই মোগল, কেবল আমরাই পাঠান ছিলাম। আগে আরও দুই এক ঘর পাঠান ছিল, কিন্তু নানারূপ অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া তাহারা দেশত্যাগ করিয়াছে। আমাদের উপরও মাঝে মাঝে অত্যাচার হইত, কিন্তু আমার পিতা সব সহিয়া থাকিতেন। বাপদাদার ভিটার মায়া তিনি ছাড়িতে পারেন নাই।"

আবদুল একটু থামিল; একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার বলিতে লাগিল,—"আমরা কিন্তু কোন দিনই ফৌজ-

দার সাহেবের মন্দ করি নাই। বরং অনেক লড়া'য়ে বুক দিয়া তাঁর ধনমান বাঁচাইয়াছি। তথাপি তিনি যে কেন আমাদের উপর অত্যাচার করিতেন, তাহা তিনিই জানেন। তিনি আমাদিগকে শত্রুর মত দেখিতেন, কেবল আমাদের ছল খুঁজিয়া বেড়াইতেন। তিনি ছাড়া আরও অনেকেই আমাদের এই রকম শত্রু ছিল। কিন্তু এতদিন কেহ কিছু করিতে পারে নাই। এবার একটা ছল ধরিয়া, সকলে আমার এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। দুষমনেরা ঘর বন্ধ ক'রে তিনটে মানুষকে জীয়ন্তে আগুনে পুড়িয়েছে।"

আবদুল দুইহাতে আপনার বুক চাপিয়া ধরিল। শঙ্কর স্থির ভাবে বসিয়া সমস্ত শুনিলেন। শুনিয়া তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"এ ভীষণ অত্যাচারের প্রতিরোধ করিতেই হইবে ঠাকুর!"

আবদুল বলিল,—"এর শোধ চাই ঠাকুর। আমার যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহাতে আর এক তিলও বাঁচ্‌বার ইচ্ছা নাই। কিন্তু কেবল এর শোধ লইবার জন্যই এখনও বাঁচিয়া আছি। শত্রু না মারিয়া পাঠান মরিতে পারে না।"

রূপনাথ বলিলেন,—"কিন্তু এখানে আসিলেই যে শোধ লইতে পারিবে, ইহা তোমায় কে বলিল?"

আবদুল বলিল,—"আল্লা বলেছেন। আমি ফৌজদারকে

মারিয়া যখন বাহিরে আসিলাম, তখন পাগলের মত হইয়াছিলাম। আমার বুকটা হুহু করিয়া জ্বলিতেছিল। আমি ছুটিয়া মাঠের দিকে চলিলাম। মাঠের মাঝে একটা বড় পুকুর। সেই পুকুরের ঠাণ্ডা জল দেখিয়া আমার মরিবার লোভ হইল। আমি ছুটিয়া গিয়া জলে নামিলাম। কিন্তু তখনই কে যেন আমার বুকের ভিতর বসিয়া বলিল, 'এখন মরিস্ না আবদুল! আগে শত্রু মারিয়া পরে মরিবি। এই অত্যাচার দমনের জন্য এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। সেইখানে যা, শান্তি পাইবি। এখন মরিলে তোর বুকের আগুণ নিভিবে না'?"

আবদুলের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। রূপনাথ ও শঙ্কর সবিস্ময়ে তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। আবদুল বলিল,—"ঠাকুর! আমি আল্লার আদেশে এখানে আসিয়াছি, আমার বুকের আগুণ কি নিভিবে না?"

শঙ্কর দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"নিশ্চয়ই নিভিবে।"

শঙ্কর রূপনাথের মুখের দিকে চাহিলেন। কিন্তু রূপনাথের স্থিরদৃষ্টি তখন ঊর্দ্ধে স্থাপিত। তিনি তখন মনে মনে বলিতেছিলেন,—"এ কি খেলা ঠাকুর! এই বিপন্ন মুসলমানের সহিত কেন এ প্রতারণা? দীন হীন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এ ব্রাহ্মণ কি তোমার এই মহৎ কার্য্যভার গ্রহণের

যোগ্য? তবে এস লীলাময়! এই দুর্ব্বল ব্রাহ্মণের ক্ষুদ্র হৃদয়রথে দাঁড়াইয়া, একবার পথ দেখাইয়া দাও দেখি,—আবার একবার তেমনই করিয়া বল দেখি,—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥"

রূপনাথের উভয় গণ্ড বহিয়া প্রেমাশ্রুধারা গড়াইতে লাগিল; তাঁহার হৃদয় মধ্যে যেন অনন্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে থাকিল,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥"

শঙ্কর ও আবদুল সবিস্ময়ে কণ্টকিত শরীরে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিভীষণ।

দেবীগড়া গ্রামখানি দুর্ভেদ্য দুর্গবৎ না হইলেও বেশ সুরক্ষিত। তখনকার প্রধান প্রধান জমিদারগণের বাসস্থান প্রায়ই গড়বন্দী হইত। দেবীগড়াও সেইরূপ গড়বেষ্টিত ছিল। তাহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ প্রান্ত বেষ্টন করিয়া খরস্রোতা শঙ্খেশ্বরী প্রবাহিতা। উত্তরে ক্ষেত্রে জলসেচনের নিমিত্ত একটী নাতি-বিস্তৃত খাল। খালটী শঙ্খেশ্বরীর সহিত সংযুক্ত। খালের উভয় পার্শ্বে কণ্টকবিশিষ্ট ঘন বংশশ্রেণী; তাহা এত বিস্তৃত ও ঘন সন্নিবিষ্ট যে, বন্দুকের গুলিও তাহা ভেদ করিতে অসমর্থ। এই তিন দিক্ দিয়া শত্রু আক্রমণের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কেবল গ্রামের পশ্চিমভাগটাই অরক্ষিত ছিল। এই দিক দিয়াই ফৌজদার সাহেব কয়েকবার আক্রমণ করিয়াছিলেন।

শঙ্কর ও রূপনাথ এক্ষণে সেই দিকের সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। সুবিধাও হইল। যে সকল প্রজাকে ফৌজদারের অত্যাচারে রাজনগর ত্যাগ করিতে হইল,

তাহাদের মধ্যে অনেকেই আসিয়া রণজিৎ রায়ের আশ্রয় লইল। গ্রামের পশ্চিম দিকে প্রান্তরের দক্ষিণাংশে একটা ক্ষুদ্র জঙ্গল ছিল। এক্ষণে সেই জঙ্গল কাটিয়া সমাগত প্রজাদিগকে তথায় বাস করান হইল। তদ্ব্যতীত গ্রামে যত নীচজাতীয় লাঠীয়াল ছিল, তাহারা সকলেই সেই স্থানের মধ্যে মধ্যে বসতি স্থাপন করিল। দেখিতে দেখিতে সেই জঙ্গলময় প্রান্তর ভূমি একখানি অধিবাসিপূর্ণ গ্রামে পরিণত হইল। ইহাতে দুই কাজই হইল। একটা নূতন গ্রাম স্থাপন এবং নগর রক্ষার বন্দোবস্ত উভয়ই সুসম্পন্ন হইল। রূপনাথ সেই নব প্রতিষ্ঠিত গ্রামের নাম শঙ্করপুর রাখিলেন।

নগররক্ষার বন্দোবস্তের পর উভয়ে সৈন্যসংগ্রহে মনো-নিবেশ করিলেন। অল্পায়াসেই দুই সহস্রাধিক সৈন্য সংগৃহীত হইল। অত্যাচার-প্রপীড়িত শত শত প্রজা আসিয়া সৈন্য-শ্রেণীতে যোগ দিল। তখন বাঙ্গালীরা প্রায় সকলেই অস্ত্র ধরিতে জানিত, যে অস্ত্র ধরিতে পারিত না, সে অন্ততঃ লাঠী ধরিতেও পারিত। শঙ্কর মহোৎসাহে এই সকল নবা-গত সৈন্যের শিক্ষাদান এবং অস্ত্রসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। রণজিৎ বৃদ্ধ, তিনি এ বয়সে আর স্বয়ং যুদ্ধাদি ব্যাপারে যোগ দেওয়া উচিত মনে করিলেন না। তিনি সমস্ত ভার শঙ্করের উপর দিয়া কেবল অর্থসঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিলেন।

এতদূর হইলেও বৃদ্ধ রণজিৎ কিন্তু সুবাদারের প্রাপ্য কর নিয়মিত সময়ে পাঠাইতে তিলমাত্র ব্যতিক্রম করিলেন না। বরং তদ্বিষয়ে আরও একটু অধিক সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। শঙ্কর প্রথমে ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু রণজিৎ সে আপত্তি শুনেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন,—"বাবাজি! সব ভারতো তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছি; এ বুড়াকে কেবল একটা ভার লইয়া থাকিতে দাও। সময় হইলে আমিই সে ভারটা ছাড়িয়া দিব।"

দূরদর্শী বৃদ্ধ বুঝিয়াছিলেন যে, সে সময় আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব, আসিবে কি না, তাহাও সন্দেহ। তবে দিল্লীর সিংহাসনের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে এক একটু আশারও সঞ্চার হইতেছিল। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি তখনও সুপ্তশার্দ্দূলকে জাগাইতে সাহস করেন নাই। তিনি কেবল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই সম্ভাবিত সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সুচতুর রণজিৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিলেন, তাঁহার যে সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট নহে। ফৌজদার যদি অন্য কোন স্থান হইতে সাহায্য পাইয়া প্রবলবেগে আক্রমণ করে, তাহা হইলে এই সকল অর্দ্ধশিক্ষিত সৈন্যের দ্বারা তাহার প্রতিরোধ করা অসম্ভব। এখনও সমস্ত সৈন্য যুদ্ধস্থলে

দাঁড়াইবার উপযুক্ত হয় নাই এবং যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রাদিও অধিক পরিমাণে নাই। এই সময়ে ফৌজদার নববলে আক্রমণ করিলে সমূহ বিপদ। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বৃদ্ধ একটা চাল চালিলেন। তিনি শান্তি প্রার্থনায় ফৌজদারের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া আপাততঃ তাহাকে কিছুদিন স্তোকবাক্যে মুগ্ধ রাখাই সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। আজি কালি করিতে করিতে ছয় মাস কাটিয়া যাইবে। এই সময়ের মধ্যে তিনি যুদ্ধের নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইতে পারিবেন।

অনেক চিন্তার পর রণজিৎ, সুচতুর ও প্রভুভক্ত দেওয়ান রামরূপকেই দূতরূপে প্রেরণ করিতে স্থির করিলেন। তখন তিনি তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া এবং যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়া ফৌজদারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু সুবিজ্ঞ রণজিৎ এইখানেই একটা মস্ত ভুল করিলেন। তা তাঁহারই বা দোষ কি, দোষটা বিধাতার।

যেখানে লঙ্কাকাণ্ড, সেইখানেই বিভীষণ; যেখানে হলদীঘাট, সেইখানেই মানসিংহ; যেখানে প্রতাপাদিত্য, সেইখানেই ভবানন্দ; যেখানে পলাশী, সেইখানেই মীরজাফর। বিধাতার যেন ইহা একটা চিরপ্রচলিত অলঙ্ঘ্য নিয়ম। পৃথিবীর—বিশেষতঃ, ভারতবর্ষের যেন ইহা একটা চিরকলঙ্কিত

অভিশাপ। তা' তোমরা বিভীষণকে যতই ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ন্যায়বীর বলিয়া কীর্ত্তন কর না কেন, আমি তাহাকে কোন দিনই প্রশংসা করিতে পারিব না। কাব্যে তাহার স্থান যতই উচ্চে হউক না কেন, ইতিহাস তাহাকে চিরদিনই দেশদ্রোহী কুলাঙ্গার বলিয়া ঘোষণা করিবে। কবির তুলিকা তাহাকে যতই দৈবচরিত্রে চিত্রিত করুক না কেন, ঐতিহাসিক কোন দিনই তাহার মস্তকে নিদারুণ ঘৃণা ও অভিসম্পাতের বজ্রধারা বর্ষণ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। যাহাই হউক, বিধাতার অলঙ্ঘনীয় নিয়মানুসারে এখানেও একজন গৃহভেদী বিভীষণের অভাব হইল না। এই বিভীষণ আর কেহই নহে, রণজিৎ রায়ের বিশ্বস্ত দেওয়ান রামরূপ সিংহ।

রামরূপ জাতিতে উগ্রক্ষত্রিয়। কিন্তু বহুদিন, এমন কি পিতামহের আমল হইতে বঙ্গদেশে বাস হেতু সম্পূর্ণ বাঙ্গালীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। রামরূপ সুচতুর, মেধাবী, কর্ম্মঠ; রামরূপ বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত, মিষ্টভাষী। এই সমস্ত গুণ দেখিয়াই রণজিৎ তাহাকে সামান্য পদ হইতে উন্নীত করিয়া দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রামরূপও প্রাণপণে আপনার কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু সহসা ঈর্ষ্যা নামক একটী অপদেবতা আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। সহসা যেন কোথা হইতে একটা

অচিরোদিত প্রভুত্বের শক্তি আসিয়া তাহার অপ্রতিহত প্রভুত্ব ও ক্ষমতার উপর নিদারুণ কষাঘাত পরিল। তাহাতে রামরূপের হৃদয়টা কঠোর যন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়স্থিত অপদেবতাটী তাহার ব্যথিত হৃদয়ে একটা সর্ব্বনাশকর উত্তেজনার মন্ত্র ঢালিয়া দিতে লাগিল। সে উত্তেজনায় রামরূপের হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হইল, সে অচিরেই কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল।

রামরূপের দুই বিবাহ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দুই বিবাহ সত্ত্বেও তাহাকে এই ত্রিংশদ্বর্ষ বয়সেই গৃহহীন হইতে হইয়াছে। যৌবনোন্মেষের পূর্ব্বেই তাহার পত্নীদ্বয় অকালে পরলোক যাত্রা করিয়াছে। এক্ষণে রামরূপের শূন্যগৃহে একমাত্র বৃদ্ধা মাতা ভিন্ন আর কেহই নাই। অর্থের বা পাত্রীর অসদ্ভাব না থাকিলেও রামরূপ আর দারপরিগ্রহ করে নাই। কেন করে নাই, তাহা কেহ জানে না, সেও কাহাকেও বলে না। তবে রাত্রিকালে সে প্রায়ই গৃহে থাকিত না। কোথায় থাকিত, তাহা কেহ কখনও অনুসন্ধান করে নাই। মাতা জিজ্ঞাসিলে রামরূপ বলিত, মনিববাড়ীতেই ছিলাম। মাতা তাহাই বুঝিতেন। তিনি জানিতেন, শূন্যগৃহে ছেলের মন টিকে না। তবে অন্য কেহ না জানিলেও আমরা সবিশেষ অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে, সে প্রায় প্রত্যহই অতি

প্রত্যূষে পতিহীনা অবিগতযৌবনা গয়লাবোয়ের বাটী হইতে বহির্গত হইত। কিন্তু সে কথার সহিত আমাদের এ আখ্যায়িকার কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং তাহার সত্যাসত্য বিনির্ণয় নিষ্প্রয়োজন।

সম্প্রতি রূপনাথের উপর রামরূপের একটু বিষদৃষ্টি পড়িয়াছিল। যে দিন রূপনাথ ফৌজদারের সহিত যুদ্ধে প্রথম জয়লাভ করিলেন, সেই দিন হইতেই তিনি সকলের নিকট অধিক সম্মান ও গৌরব প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহাকে ভক্তি ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল, সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রবল বিক্রম ও অদ্ভুত কৌশলের কথা লইয়া সগৌরব আন্দোলন চলিল। কিন্তু কেন জানি না, এই কথাগুলা রামরূপের কর্ণে যেন কেমন কেমন ঠেকিল; বোধ হয় একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তুচ্ছ লাঠীবাজির জন্য এতটা উচ্চপদ দেওয়া তাহার মতে ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য। তাহার পর বৃদ্ধ রণজিৎ স্বয়ং যখন সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন, শঙ্কর তাঁহাকে আপনার গুরুপদে বরণ করিলেন, তখন রামরূপের নিকট সেগুলা অসহ্য ও বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ হইল। ইহার পর আবার ফৌজদারের সহিত যুদ্ধ বাধিল, আবার রূপনাথ তাহাতে জয়লাভ করিলেন। সকলে সমস্বরে তাঁহার জয়

ঘোষণা করিল, চারিদিকে তাঁহার বিজয়গীতি কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। অনেকে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিল। রামরূপের আর সহ্য হইলনা। সৈন্যেরা যুদ্ধজয় করিল, আর নাম কিনিল এই ভণ্ড ভিক্ষুক ব্রাহ্মণটা? রামরূপ স্থির বুঝিল, লোকগুলা পাগল হইয়াছে। নিতান্ত অসহ্য হইলে রামরূপ একদিন প্রভুর নিকট আপনার মনোভাব জ্ঞাপন করিল। কিন্তু তাঁহার নিকট যাহা শুনিল, তাহাতে সে বুঝিল, বাবুর ভীমরথী হইয়াছে, নতুবা কি তিনি এই হতভাগ্য ব্রাহ্মণটাকে একেবারে অবতারের পদে বসাইতে চাহেন? এবার রাম রূপের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। হায় ঈর্ষ্যা! কোন্ নিষ্ঠুর বিধাতা তোমাকে সৃষ্ট করিয়াছিল?

কিন্তু ইহা ছাড়া তাহার রূপনাথের উপর বিদ্বেষের আরও একটা কারণ ছিল। রূপনাথের বাটীর পার্শ্বেই রামরূপের বাটী। একদিন রামরূপ বাটীর ছাদে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কমলার অসাধারণ রূপ—অলৌকিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াছিল। কমলার সেই শান্ত সৌন্দর্য্যালোকে আলোকিত রূপনাথের ক্ষুদ্র গৃহখানি দেখিয়া সে আপনার উচ্চ অট্টালিকার দিকে চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে একটা হতাশ ও বিষাদের গাঢ় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় নাই। একটা অব্যক্ত বেদনা হৃদয়ে চাপিয়া সে ভাবিয়াছিল, 'হায়, বিধাতার

কোন্ নিষ্ঠুর অভিশাপে আলোকের পার্শ্বে এই ঘনান্ধকার?'

ইহার পর রামরূপ আরও দুই একবার কমলাকে দেখিল, দেখিয়া দেখিয়া হৃদয়ে একটা আগুন জ্বালাইল। কিন্তু রূপনাথের বিক্রমের কথা স্মরণ করিয়া সে কেবল একটা ভগ্ন হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। ভাবিল, রূপনাথ থাকিতে তাহার বাসনা সিদ্ধির আশা সুদূর-পরাহত। তাই বলিয়া সে আশা ছাড়িলনা।

দিন দিন রূপনাথের নাম ডাক যতই বাড়িতে লাগিল, ততই রামরূপের হৃদয়ে দাবদাহ আরম্ভ হইল। তখন কৌশলী রামরূপ এই ব্রাহ্মণের উচ্চ গৌরবের মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য, তাহাকে নির্ম্মূল করিয়া আপনার বাসনাসিদ্ধির জন্য, এক ভীষণ ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিল। সে ষড়যন্ত্রের ফলে রামরূপের সর্ব্বনাশ হইল, রণজিতের সর্ব্বনাশ হইল, দেশের সর্ব্বনাশ হইল!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামরূপ সুচতুর। তাহার চতুরতা-পূর্ণ তীক্ষ্নদৃষ্টির নিকট কাহারও হৃদয়ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিবার উপায় ছিল না। এই তীক্ষ্নদৃষ্টি [illegible] বহুদিন হইতে কৃষ্ণকান্তের হৃদয়টা স্পষ্ট [illegible]। এক্ষণে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির [illegible] য়া সে অতি গোপনে কৃষ্ণকান্তের সাক্ষা[illegible] অতি সঙ্গোপনে

যাতায়াত ও পরামর্শ চলিতে লাগিল; যাতায়াতে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইল। ক্রমে পার্ব্বতীও আসিয়া এই পরামর্শে যোগ দিল। ধূমায়মান বহ্নির সহিত প্রবল বায়ু সম্মিলিত হইল। তখন একটা প্রলয়ানল জ্বালিবার নিমিত্ত কৃষ্ণকান্ত, পার্ব্বতী ও রামরূপ তিনজনে এক ভীষণ চক্রান্তের পরামর্শ করিল।

বৃদ্ধ রণজিৎ এতটা জানিতেন না। তিনি সরলভাবে রামরূপকে সমস্ত কথা বলিয়া তাহাকে ফৌজদারের নিকট প্রেরণ করিলেন। রামরূপও সানন্দে এই কার্য্যভার গ্রহণ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

——০:)৯:(:০——

মরিব না, ভালবাসিব।

চন্দ্রা পিতার সহিত বাটীতে প্রবেশ করিয়া আপনার কক্ষে আসিল। আসিয়াই শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল,—দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া খানিকটা কাঁদিল। তারপর ভাবিল, হায়, কেন আসিতে বারণ করিলাম? তাঁহাকে না দেখিয়া আমি কি থাকিতে পারিব? চন্দ্রার মনে হইল, সে তখনই ছুটিয়া গিয়া শঙ্করের পায়ে ধরিয়া বলে, "না না, তুমি আসিও।" কিন্তু অমনই পিতার নিষেধ, বিমাতার তিরস্কার মনে পড়িল। তখন চন্দ্রা আবার উপাধান সিক্ত করিয়া অজস্রধারে কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু সে বুঝিতে পারিল না, কেন পিতার এই কঠোর নিষেধাজ্ঞা, কেন বিমাতার সরোষ তিরস্কার। সে কেবল কাঁদিতে জানিত, কাঁদিতেই লাগিল। প্রভাত-সূর্য্যালোক মুক্ত বাতায়নপথে আসিয়া তাহার মুখের উপর নাচিতে লাগিল।

দ্বারদেশ হইতে পার্ব্বতী ডাকিল,—"চন্দ্রা!"

চন্দ্রা তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। পার্ব্বতী গৃহে প্রবেশ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল,—"আবার কাঁদিতেছিস্ ?"

চন্দ্রা কোন উত্তর দিলনা, কেবল অঞ্চলে বারবার চক্ষু মুছিতে লাগিল। পার্ব্বতী বলিল,—"আজ আবার সে আসিয়াছিল ?"

চন্দ্রা নতমুখে বলিল,—"হাঁ।"

পা। আবার তাহার সহিত কথা কহিতেছিলি ?

চন্দ্রা কোন উত্তর করিলনা।

পা। আজ তোকে অনাহারে থাকিতে হইবে।

চন্দ্রা। নীরব।

পা। তুই তাহাকে ভালবাসিস্ ?

চন্দ্রা পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিল। পার্ব্বতী আবার পরুষ কণ্ঠে বলিল—"সত্য কথা বল্, তুই তাহাকে ভালবাসিস্ কি না ?"

চন্দ্রা দৃষ্টি নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"বাসি।"

পার্ব্বতী ক্রুদ্ধা ব্যাঘ্রীর ন্যায় চন্দ্রার উপর পড়িল। তাহার দীর্ঘ কেশগুচ্ছ সবলে আকর্ষণ করিয়া বলিল,—"হতভাগি ! কুলে কালি দিতে বসিয়াছিস্ ? আজ তোর ভালবাসার সখ মিটাইব।"

পার্ব্বতী চন্দ্রার কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে শয্যা হইতে টানিয়া আনিল। সে আকর্ষণে চন্দ্রা কাতর হইয়া পড়িল, তাহার মাথার ভিতরটা ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। কিন্তু সে কোন কথাই বলিলনা, একটুও কাতরতা প্রকাশ করিলনা। কেবল অশ্রুধারে তাহার উভয় গণ্ড প্লাবিত হইতে লাগিল। কিন্তু সে অশ্রুতে পার্ব্বতীর প্রাণ গলিলনা। সে সমান ভাবে, কেশগুচ্ছ টানিয়া বলিল,—"প্রতিজ্ঞা কর্, তাহাকে ভুলিবি?"

চন্দ্রা নীরবে তাহার সজল দৃষ্টিখানি তুলিয়া বিমাতার মুখের উপর স্থাপন করিল। পার্ব্বতী বলিল,—"ও ডাইনীর মায়ায় আমি ভুলি না। তাহাকে ভুলিবি কিনা বল্?"

চন্দ্রা কোন উত্তর দিলনা। ক্রুদ্ধা পার্ব্বতী তাহার মাথাটা আর একবার নাড়িয়া দিয়া বলিল,—"এখনও বল্ ভুলিবি কি না?"

যন্ত্রণায় চন্দ্রা অস্থির হইয়া পড়িল। পার্ব্বতী তাহার মুখের উপর ক্রোধজ্বলিত দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল,— "ভুলিবি?"

চন্দ্রা স্থির কণ্ঠে উত্তর করিল,—"না।"

"রাক্ষসি!" বলিয়া পার্ব্বতী সবলে তাহার পৃষ্ঠে পদাঘাত করিল। চন্দ্রা "মাগো" বলিয়া হর্ম্ম্যতলে লুটাইয়া পড়িল।

তখন পার্ব্বতী সশব্দ পদক্ষেপে কক্ষ হইতে বহির্গত হইল। বাহিরে আসিয়া কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিতে করিতে বলিল,—"আমি থাকিতে শঙ্কর কিছুতেই তোর হইবে না।"

দ্বার রুদ্ধ হইল। ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে পার্ব্বতী তথা হইতে প্রস্থান করিল। আর চন্দ্রা সেই হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিল, "যদি শঙ্করকে পাইবার জন্য ভালবাসিতাম, তবে আজিই মরিতাম। কিন্তু আমিতো সে আশায় ভালবাসি না, তবে কেন মরিব? আমি মরিব না, ভুলিব না, কেবল ভালবাসিব।"

পার্ব্বতী বাহিরে আসিয়াই কৃষ্ণকান্তকে দেখিতে পাইল। তীব্রস্বরে বলিল,—"তোমার মেয়ের গুণ শুনিয়াছ?"

কৃষ্ণকান্ত সবিস্ময়ে বলিলেন,—"কি?"

পা। সে শঙ্করকে ভালবাসিয়াছে।

কৃ। কে বলিল?

পা। সে নিজ মুখে বলিয়াছে।

কৃষ্ণকান্ত একটু চিন্তিত হইলেন। পার্ব্বতী বলিল,—"কি ভাবিতেছ?"

কৃ। তবে উপায়?

পা। উপায় এখনও আছে।

কৃ। কি?

পা। তাহার এ ভালবাসা নষ্ট করিতে হইবে।

কৃ। কি উপায়ে?

পা। এস বলিব।

পার্ব্বতীর সহিত কৃষ্ণকান্ত অন্য কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঠিক তখনই কক্ষান্তরে পড়িয়া চন্দ্রা ভাবিতেছিল, "মরিব না, ভুলিব না, কেবল ভালবাসিব।"

নবম পরিচ্ছেদ।

———০ঃ৲ঃ*ঃ(ঃ০———

মেঘ ডাকিল।

ফৌজদারের সহিত সমস্ত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া একদিন পরে রামরূপ প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাহার সহিত ফৌজদারের জনৈক কর্ম্মচারী আসিল। রামরূপ ফিরিয়া আসিয়া রণজিৎকে বলিল,—"ফৌজদার সাহেব সন্ধিস্থাপন করিতে সম্মত আছেন; সমস্ত কথাবার্ত্তা ঠিক করিবার জন্য জনৈক বিশ্বস্ত দূত প্রেরণ করিয়াছেন।"

কৌশল সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া রণজিৎ আনন্দিত হইলেন, এবং সমাগত দূতের বাসস্থানাদি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। আবদুল গোপনে থাকিয়া এই দূতকে দেখিল,দেখিয়া গোপনে তাহার উপর একটু লক্ষ্য রাখিল। কিন্তু মনের কথা কাহাকেও বলিল না।

দুই তিন দিন কাটিয়া গেল,সন্ধির বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা হইলনা। রণজিৎ তাহাতে বিশেষ মনোযোগ করিলেন না। এ দিকে রামরূপ সর্ব্বদাই প্রায় আগত দূতের সহিত দেখা

সাক্ষাৎ করিত, মধ্যে মধ্যে তাহাকে আপনার বাটীতেও লইয়া যাইত; অতি গোপনে উভয়ের মধ্যে গুপ্ত পরামর্শও চলিত। আর কেহ সে দিকে লক্ষ্য না করিলেও তাহা আবদুলের সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই।

একদিন রাত্রিকালে রূপনাথ আপনার গৃহমধ্যে বসিয়া সেতারে ঝঙ্কার দিতেছিলেন। অনেকক্ষণের পর সেতারটা ঠিক বাঁধা হইল, সুরে সুর মিলিল; তখন রূপনাথ তাহার মধুর ঝঙ্কারের সহিত আপনার মধুময় কণ্ঠ মিলাইয়া ভৈরবীতে গান ধরিলেন,—

একবার তেম্‌নি করে নাচ্ দেখি মা এলোকেশে মোহনবেশে।

কমলা আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইল। ঈষৎ হাসিয়া একটু গ্রীবা বাঁকাইয়া বলিল,—"একটা কথা শুন্‌বে কি?"

কথাটা বুঝি রূপনাথের কাণে গেল না। তিনি আপন মনে গাহিলেন,—

তেম্‌নি গলে মুণ্ডমালা তেম্‌নি অট্টহাসি হেসে।

কমলা আরও একটু উচ্চকণ্ঠে বলিল,—"একবার গানটা রেখে কথাটাই শোন না।"

রূপনাথ গাহিতে লাগিলেন,—

তেম্‌নি কালো রূপের রাশি, তেম্‌নি করে নাচ্‌বে অসি,
কোটি রবি কোটি শশী, তেম্‌নি পদনখে পড়্‌বে খসে।

কমলার আর সহ্য হইল না। সে এবার রূপনাথের নিকটে গিয়া তাঁহার ক্রোড় হইতে সেতারটা কাড়িয়া লইল। তারপর সেটাকে ঘরের এককোণে রাখিয়া আসিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইল। রূপনাথ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন,—"দরিদ্রের ভগ্ন কুটীরে এ ভৈরবী মূর্ত্তি কেন?"

কমলা ভ্রুভঙ্গী করিয়া বলিল,—"তোমার গানের জ্বালায়। ও ছাই ঘ্যানর্ ঘ্যানর্ রাতদিন ভাল লাগে না।"

রূপ। কেন হিংসা হয় না কি?

কমলা গ্রীবাভঙ্গী করিয়া বলিল,—"কেন হবে না?"

রূপ। তা' না শুন্‌লেই হ'লো?

কম। আমি তো শুন্‌বার জন্য হাঁ করে ব'সে আছি।

রূপ। তবে ও গরীবের উপর এত অত্যাচার কেন?

কম। ও আমার কথায় বাধা দেয় কেন?

রূপ। সেটা ওর ঝক্‌মারি হয়েছে বটে। তা' তোমার আবার কথা কি?

কম। কেন, আমার কি কোন কথা নাই?

রূপ। তাতো এই নূতন শুন্‌ছি। তা' সেটা সময় মত বল্‌লে কি চল্‌তো না?

কম। তোমার কোন্‌টা সময় কোন্‌টা অসময় তাতো

বুঝ্‌তে পারি না। সময়ে লড়াই, অসময়ে গান, তার ভিতর অন্য সময় কোন্‌খানটায়?

রূপ। আর অন্য সময়ের বিশেষ প্রয়োজনই বা কি?

কম। এদিকে সংসারটা কে দেখ্‌বে?

রূপ। স্বয়ং কমলা যার সংসারের ভাবনা ভাবে, সে ওদিক্‌টা নাই দেখ্‌লে?

কমলা হাসিয়া ফেলিল। রূপনাথ বলিলেন,—"ব্যাপার কি কমলা?"

কম। মা যে কাশী যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন।

রূপ। কেন, তাঁর কি এখানে কোনরূপ অসুবিধা হচ্চে?

কম। অসুবিধা না হলেও তিনি বলেন, বয়স তো হয়েছে। আর শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে এখানে মরার চেয়ে বিশ্বেশ্বরের পায়ে দেহটা রাখাই ভাল।

রূপনাথ একটু ভাবিলেন। বলিলেন,—"উত্তম কথা। কিন্তু অনেক টাকার দরকার।"

কম। তাঁর কিছু টাকা আছে, বাকী তুমিও কিছু দাও।

রূপ। আমি টাকা কোথায় পাব কমলা?

কম। কেন, এত বড় সেনাপতি তুমি, দেশ জুড়ে নাম ডাক, আর টাকা কোথায় পাবে?

রূপনাথ গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,—"কমলা ?"

কম। কি ?

রূপ। কেন আমার এত নাম ডাক, কিসের জন্য আমার এত আয়োজন—এত পরিশ্রম, তা'কি তুমি জান না কমলা ?

কম। জানি।

রূপ। তবে আবার ও কথা কেন বলিতেছ ? আমি কি টাকার জন্য মাতৃপদে দেহ উৎসর্গ করিয়াছি ?

কম। আমি রহস্য করিতেছিলাম, আমাকে ক্ষমা কর। কিন্তু মা'র এখন কি উপায় করা যায় ?

রূপ। তুমিই বল দেখি ?

কম। আমাদের যে কিছু জমি জমা আছে, তাই এখন বন্ধক দিয়া মাকে কাশী পাঠালে হয় না ?

রূপনাথ একটু হাসিলেন। বলিলেন,—"রাজাকে বলিলেই তিনি সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।"

কম। রাজার নিকট হইতে অর্থ লইবে ?

রূপ। কেন দোষ কি ?

কম। তুমি কি রাজদাস ?

রূপনাথ কমলাকে বুকের উপর টানিয়া লইলেন। বলিলেন,—"না কমলা! মাতৃপদ ভিন্ন আর কোথাও এ দেহ বিক্রীত নহে। টাকার উপায় করিব।"

সহসা বাহির হইতে একটা করুণ আর্ত্তনাদ উঠিল। রূপনাথ দ্রুতপদে বাটীর বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু একটু দূর হইতে আবার সেই আর্ত্তনাদ উঠিয়া নৈশ-গগনে বিলীন হইল। রূপনাথ সেই স্বরের অনুসরণ করিয়া দ্রুতপদে চলিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া একবার দাঁড়াইলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জ্জন পথ। সে পথে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সেই স্বর শুনিবার জন্য একবার উৎকর্ণ হইলেন। আবার—আবার দূরোত্থিত করুণ স্বর তাঁহার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইল। তিনি সেই দিকে ছুটিয়া চলিলেন। কিন্তু তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, সেই হৃদয়-দ্রবকারী করুণ স্বরও তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া ততই দূর হইতে দূরে ছুটিল।

ক্রমে রূপনাথ লোকালয় ছাড়িয়া নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে আসিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে একবার দাঁড়াইলেন। সহসা পশ্চাৎ হইতে একটা বর্শা আসিয়া তাঁহার বাম বাহুতে বিদ্ধ হইল। তিনি চমকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, শত্রু সম্মুখে। দুইজন মুসলমান তাঁহাকে আক্রমণোদ্যত হইয়াছে। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে আপনার বাহুবিদ্ধ বর্শা টানিয়া লইয়া তাহা ধারণ করিলেন।

বর্শার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাহু হইতে রক্তধারা ছুটিল। রূপনাথ তাহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া শত্রুদ্বয়ের সম্মুখে লাফাইয়া পড়িলেন। অমনই একজন আক্রমণকারী তাঁহার স্কন্ধ লক্ষ্য করিয়া অসি তুলিল। রূপনাথ ক্ষিপ্রগতিতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। আক্রমণ ব্যর্থ হইল। তখন রূপনাথ ছুটিয়া আসিয়া সবলে আক্রমণকারীকে পদাঘাত করিলেন। সে আঘাতে আক্রমণকারী দশহস্ত দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, তাহার হাতের অসি মাটিতে পড়িয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্তে অপর আক্রমণকারী রূপনাথকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা তুলিল। রূপনাথ আপনার হস্তস্থিত বর্শা ঘুরাইয়া তাহার সে আক্রমণ ব্যর্থ করিলেন এবং তাহাকে মারিবার জন্য আপনার বর্শা তুলিলেন। আক্রমণকারী আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল।

তখন পদাহত আক্রমণকারী উঠিয়া বসিয়াছে। রূপনাথ তাহার নিকটে আসিলেন। বলিলেন,—"কে তোরা ?"

সে বলিল,—"বলিব না।"

রূপনাথ বর্শা উদ্যত করিয়া বলিলেন,—"না বলিলে এখনই বর্শাবিদ্ধ করিব।"

আক্রমণকারী বলিল,—"তথাপি বলিব না।"

এমন সময় অদূরে অনেকগুলা দ্রুত পদশব্দ শ্রুত হইল।

রূপনাথ বুঝিলেন, শত্রুর সংখ্যা অল্প নহে। এদিকে তখনও তাঁহার বর্শাবিদ্ধ বাহু হইতে শোণিতস্রাব হইতেছে, তাহাতে দেহ ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। তখন তিনি আর সে স্থানে অপেক্ষা করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। তৎক্ষণাৎ দ্রুতপাদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

যে মুহূর্ত্তে রূপনাথ বাটীর বাহির হইয়া স্বরের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহার পর মুহূর্ত্তেই দুই ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার বাটীর দ্বারে দাঁড়াইল। তারপর যখন রূপনাথের পদশব্দ দূরে মিলাইয়া গেল, তখন আগন্তুকদ্বয়ের একজন অপরের কাণে কাণে কি কথা বলিয়া উন্মুক্ত দ্বারপথে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, অপর ব্যক্তি অসি হস্তে প্রহরীস্বরূপে দ্বার-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

অল্পক্ষণ অতিবাহিত হইলেই প্রহরী সাগ্রহে বার বার বাটীর মধ্যে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখিতে বা কোনও শব্দ শুনিতে না পাইয়া সে অধীরভাবে পাদচারণা করিতে থাকিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া তাহার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল। সেই অচিন্তিত আক্রমণের ভারে প্রহরী ধরাশায়ী হইল। আগন্তুক ত্বরিতগতিতে কৌশলে তাহার বুকের উপর বসিয়া একহাতে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল; এবং মৃদুস্বরে বলিল,—"গোল করিলেই কাটিয়া ফেলিব।"

প্রহরী এইরূপ অসম্ভাবিত আক্রমণে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। সে কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। তখন আগন্তুক তাহারই মাথার বৃহৎ পাগড়ী টানিয়া লইয়া তদ্দ্বারা তাহার মুখ, হাত, পা উত্তমরূপে বাঁধিয়া ফেলিল। তারপর তাহার তরবারি তুলিয়া লইয়া সতর্ক পাদবিক্ষেপে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

রূপনাথ চলিয়া গেলে কমলা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর আলোকটাকে আরও একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই এক অপরিচিত পুরুষ ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিয়াই কমলা কাঁপিয়া উঠিল। চীৎকার করিতে গেল, কিন্তু ভয়ে কণ্ঠস্বর বাহির হইল না। আগন্তুক তীব্রদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল; বলিল,— "আইস।"

কমলা নিতান্ত ভীরুস্বভাবা ছিল না, সে রূপনাথের উপযুক্ত পত্নী। কমলা বুঝিল, বিপদ বড় গুরুতর, এ সময়ে সাহসে বুক না বাঁধিলে বিপদের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইবে না। তাই আগন্তুকের কথার উত্তরে সে বলিল,—"কোথায় যাইব?"

আগন্তুক সহাস্যে বলিল,—"যেখানে গেলে সুখে থাকিবে।"

কম। সে কোথায় ?

আগ। আমার গৃহে।

কম। তুমি কে ?

আগ। আমি—আমি একজন—.

কম। তুমি একজন বিশ্বাসঘাতক।

আগ। আমি তোমার জন্যই বিশ্বাসঘাতক—তোমাকে পাইবার আশায় আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম, সংসার, স্বদেশ সকলই ছাড়িয়াছি।

কম। একটা রমণীর জন্য ধর্ম্ম ছাড়িয়াছ—স্বদেশ ভুলিয়াছ ?

আগ। স্বদেশ কোন্ ছার—তোমার জন্য প্রাণের মায়াও ছাড়িতে পারি।

কম। দেশের চেয়ে প্রাণটা কি বড় ?

আগ। সে কথা পরে হ'বে, এখন আমার সঙ্গে এস।

কম। যদি না যাই ?

আগ। বলপূর্ব্বক নিয়ে যাব।

কম। বিশ্বাসঘাতক নরাধমের আবার বল!

কমলা ভাবিতেছিল, কোনরূপে বিলম্ব করিলেই স্বামী আসিয়া পড়িতে পারেন। আগন্তুকও তাহা বুঝিতে পারিল। বলিল,—"সুন্দরি! যদি গোলামের শক্তি পরীক্ষাই তোমার অভিপ্রায় হয়, তবে তাহাই হউক।"

আগন্তুক কমলাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। কমলা দুই পদ পিছাইয়া গেল। মনে মনে বলিল,—"কোথায় হে অনাথনাথ! দুর্ব্বলের সহায়! আমার সর্ব্বস্ব রক্ষা কর প্রভু!"

সহসা আর এক ব্যক্তি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। সে প্রবেশ করিয়াই আগন্তুককে সবলে পদাঘাত করিল। সে ভীম পদাঘাতে আগন্তুক ধরাশায়ী হইল। তখন প্রবেশকারী মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিল; তরবারি উত্তোলন করিয়া বলিল,—"নিমক্‌হারাম্!"

দ্বারপ্রান্ত হইতে কে ডাকিল,—"আবদুল!"

আবদুল চাহিয়া দেখিল, কক্ষমধ্যে রূপনাথ। রূপনাথ স্থিরস্বরে বলিলেন,—"ছাড়িয়া দাও আবদুল।"

আবদুল বলিল,—"আগে নিমক্‌হারামকে শাস্তি দিয়া তারপর আপনার আদেশ শুনিব।"

রূপনাথ গিয়া আবদুলের হাত ধরিলেন; বলিলেন,—"না আবদুল! শত অপরাধ করিলেও যুদ্ধস্থল ব্যতীত হিন্দুর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিবনা। ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা।"

আগন্তুক আর কেহ নহে, স্বয়ং রামরূপ।

আবদুল উঠিয়া দাঁড়াইল। রামরূপ ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিল। রূপনাথ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

—"তুমি না হিন্দু? হিন্দু যদি হিন্দুর সর্ব্বনাশ করে, তবে স্বর্গের দেবতা আসিলেও যে কোন উপায়ই হইবে না?"

রামরূপ অধোবদনে নিরুত্তরে রহিল। আবদুল তাহার ঘাড় ধরিয়া একটা ধাক্কা দিল। রামরূপ দ্বারের বাহিরে আসিয়া পড়িল। তারপর সে উঠিয়া ছুটিয়া পলাইল। আবদুলও রূপনাথকে সেলাম করিয়া নীরবে বাহিরে আসিল। আসিবার কালে রূপনাথ তাহাকে বলিলেন, —"লোকটা যে কে, তাহা প্রকাশ করিও না।"

বাটীর বাহিরে প্রহরী তখনও বন্ধনাবস্থায় পড়িয়াছিল। আবদুল গিয়া তাহার বন্ধন খুলিয়া দিল। প্রহরী সে স্থান ত্যাগ করিল। আবদুল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

পরদিন সমস্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। কিন্তু লোকটা যে কে, তাহা অপ্রকাশ রহিল। রূপনাথ কেবল রণজিৎকে বলিয়া রামরূপকে কর্ম্মচ্যুত করাইলেন।

রামরূপ কর্ম্মচ্যুত হইল। কিন্তু তাহাতে সে দুঃখিত হইলনা। সে এবার ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া শত্রুতা সাধনের জন্য অগ্রসর হইল।

শঙ্কর আবদুলকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"তুমি যে উপকার করিয়াছ, তাহা এজীবনে ভুলিব না। তোমার ইচ্ছামত পুরস্কার প্রার্থনা কর।"

আবদুল বলিল,—"আমি সৈন্যশ্রেণীতে প্রবেশের অনুমতি চাই।"

মুসলমান বলিয়া সে পূর্ব্বে এ অনুমতি পায় নাই।

শঙ্কর বলিলেন,—"তাহাতো এখন হইতে তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য। উহা পুরস্কার নহে,—অন্য পুরস্কার প্রার্থনা কর।"

আবদুল বলিল,—"সময় হইলে তাহা চাহিয়া লইব।"

সেই দিন হইতে আবদুল শঙ্করের শরীররক্ষক রূপে নিযুক্ত হইল।

রূপনাথ ভাবিলেন,—"জানি না, এই প্রথম মেঘাড়ম্বর হইতে পরে কি ভীষণ বজ্রাঘাত হইবে।"

দশম পরিচ্ছেদ।

—— ০ঃ)ঃ*ঃ(ঃ০ ——

সংযম ও লালসা।

শঙ্কর অনেক চেষ্টা করিয়াও চন্দ্রাকে ভুলিতে পারিলেন না। যতই তাহাকে ভুলিতে চেষ্টা করিলেন, ততই তাহার স্মৃতি আরও উজ্জ্বল আরও গভীর রূপে তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইতে লাগিল; ততই তাহার বিষাদপূর্ণ কোমল মুখখানি মধুর হইতে মধুরতর রূপে তাঁহার মানস-নয়নে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। অনেক চেষ্টাতেও শঙ্কর সে মুখখানি ভুলিতে পারিলেন না। ভুলিবার চেষ্টা করিলেই হৃদয়টা যেন ফাটিয়া যাইত, সংসারটা শ্মশানের ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিত, কর্ম্মময় কর্ত্তব্যপূর্ণ জীবন-গ্রন্থিটা শিথিল হইয়া পড়িত। শঙ্কর বুঝিলেন, ভুলিবার চেষ্টা বৃথা।

যত দিন যাইতে লাগিল, শঙ্করের হৃদয়টা ততই অস্থির হইয়া উঠিল। একদিকে কর্ত্তব্যের উচ্চ আহ্বান, অন্যদিকে ভালবাসার কোমল আকর্ষণ, একদিকে শত্রুর উত্থিত তরবারির ভীষণ দৃশ্য, অন্যদিকে প্রণয়ের স্নিগ্ধ অশ্রুধারা, এক

দিকে ভীম ঝটিকাময়ী রজনীর করাল গর্জ্জন, অন্যদিকে উষার শান্তোজ্জ্বল আলোক রশ্মি। এই মহা সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া শঙ্কর হৃদয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সে যুদ্ধে কাহারও জয় পরাজয় হইল না। উভয় পক্ষ মিলিত হইয়া একটা সন্ধি সংস্থাপন করিল। তাহাতে কর্ত্তব্যও আপনার স্বত্ব বুঝিয়া পাইল, ভালবাসাও অধিকারচ্যুত হইলনা। এ সন্ধির ঘটক রূপনাথ।

এক দিন অপরাহ্ন কালে শঙ্কর নদীতীরে ভ্রমণ করিতে-ছিলেন। অস্তগামী সূর্য্যের সুবর্ণ কিরণ আসিয়া শঙ্খেশ্বরীর বুকে পড়িয়াছিল; মৃদু বায়ু, তরঙ্গে তরঙ্গে তাহার ছোট বড় হার গাঁথিতেছিল, আর শঙ্খেশ্বরী সেই সোণালি হার গলায় দোলাইয়া আনন্দে গর্ব্বে নাচিতে নাচিতে ছুটিতেছিল। নদীর পরপারে বিশাল প্রান্তর, উর্দ্ধে সুনীল আকাশ। বহুদূরে—যেখানে আকাশে প্রান্তরে জড়াজড়ি করিয়া দর্শকের দৃষ্টিরোধ করিতেছিল, যেখানে অতি ক্ষুদ্র বৃক্ষরাজির অস্পষ্ট রেখা দৃষ্টি-গোচর হইতেছিল, সেখান হইতে অন্ধকারের অস্পষ্ট ছায়া ধীরে ধীরে প্রান্তরবক্ষে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। যেন কোন হতাশ প্রণয়ীর ব্যথিত হৃদয়ে বিস্মৃতির মসীময়ী যবনিকা অল্পে অল্পে আবৃত হইয়া তাহাকে আপনার অন্ধকার গর্ভে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

শঙ্কর স্থির দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন,—"বিস্মৃতিই মৃত্যু!" তাঁহার হৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে একটা তপ্ত শ্বাস বাহির হইয়া সান্ধ্য বায়ুপ্রবাহে মিশাইয়া গেল। তখন তিনি উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে নদীতীরের পথে ধীরে ধীরে চলিলেন। নিকটেই আবদুল ছিল, সেও তাঁহার অনুসরণ করিল। শঙ্কর ভ্রূভঙ্গি করিয়া তাহাকে অনুগমন করিতে নিষেধ করিলেন। আবদুল আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া শঙ্কর সহসা দাঁড়াইলেন। সম্মুখে কৃষ্ণকান্তের বাটী, পার্শ্বে চির পরিচিত সেফালিকা বৃক্ষ। শঙ্কর ব্যগ্র দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিলেন, সে দৃষ্টি যেন বহুদিনের পরিচিত কিন্তু বহুদিনের অদৃষ্ট কাহাকে অন্বেষণ করিল। কিন্তু সে দৃষ্টির সম্মুখে কেহ পড়িল না। কেবল সেই উচ্চ অট্টালিকা নীরবে দাঁড়াইয়া উপহাসের কঠোর হাসি হাসিল। শঙ্করের নেত্রপ্রান্ত হইতে একবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তিনি নদীতীর ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বের পথে অগ্রসর হইলেন।

পথটা ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ। তাহা কৃষ্ণকান্তের বাটীর পশ্চাৎভাগ দিয়া গ্রামের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কেহ সে পথে যায় না। শঙ্কর অন্যমনস্কতা বশতঃ সেই পথে চলিলেন। পথের বাম পার্শ্বে প্রাচীরবেষ্টিত

সুবৃহৎ উদ্যান, দক্ষিণ পার্শ্বে কৃষ্ণকান্তের বাটী। উদ্যানে যাইবার জন্য বাটীর সেই দিকে একটী ক্ষুদ্র দ্বার আছে। কিন্তু তাহা প্রায় সর্ব্বদাই রুদ্ধ থাকে।

শঙ্কর যখন চিন্তিত হৃদয়ে ধীরপদে সেই দ্বারের সমীপস্থ হইলেন, তখন উপর হইতে মৃদুস্বরে কে ডাকিল,—"শঙ্কর!"

শঙ্কর সবিস্ময়ে উর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিতে পাই-লেন, উপরে গবাক্ষ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পার্ব্বতী। পার্ব্বতী তাঁহাকে দেখিয়া হাসিল না, সেই হৃদয়ভেদী কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল না। কেবল মৃদুস্বরে বলিল,—"শঙ্কর! চন্দ্রাকে একবার দেখিবে না?"

শঙ্করের হৃদয়টা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি বিস্মিত ভাবে পার্ব্বতীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। পার্ব্বতী বলিল,—"আমরা বুঝিতে পারি নাই, তাই এমন কাজ করিয়াছিলাম। এখন চন্দ্রা যে মরিতে বসিয়াছে?"

চন্দ্রা মরিতে বসিয়াছে? শঙ্কর শিহরিয়া উঠিলেন। কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"কেন তাহার কি হইয়াছে?"

পার্ব্বতী বলিল,—"কি হইয়াছে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। এখন একবার তাহার সহিত দেখা করিবে কি?"

শঙ্কর ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন,—"করিব।"

"তবে দাঁড়াও" বলিয়া পার্ব্বতী গবাক্ষ বন্ধ করিল।

অল্পক্ষণ পরেই বাটীর ক্ষুদ্রদ্বার উন্মুক্ত হইল। শঙ্কর ভিতরে প্রবেশ করিলেন, দ্বার আবার রুদ্ধ হইল।

শঙ্করকে লইয়া পার্ব্বতী দ্বিতলের এক সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিল। সে কক্ষ শঙ্করের পরিচিত। কক্ষে প্রবেশ করিয়া তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু যাহাকে খুঁজিলেন, তাহাকে পাইলেন না। পার্ব্বতী তাঁহার মনের ভাব বুঝিল। একটু হাসিয়া বলিল,—"শঙ্কর!"

শঙ্কর বলিলেন,—"কি ?"

পা। চন্দ্রা কি আমার অপেক্ষা সুন্দরী ?

কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হইল। চমকিত হইয়া শঙ্কর বলিলেন,—"সে কথা কেন ?"

পা। কেন ? চিরদিনই কি তুমি এইরূপ নিষ্ঠুর থাকিবে ?

শ। তাহাতো অনেকদিনই বুঝিয়াছ ?

পা। বুঝিয়াছি; কিন্তু কিছুতেই কি তুমি ফিরিয়া চাহিবে না ?

শ। কিছুতেই না। তোমার এ পাপ বাসনা পরিতৃপ্ত করিতে আমি অক্ষম।

পা। কিন্তু তোমাকে না পাইলে আমি যে এরূপ সহস্র পাপে মজিব ?

শ। ঈশ্বর জানেন, তাহাতে আমার কোনই অপরাধ নাই।

তখন পার্ব্বতী শঙ্করের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। কাতর কণ্ঠে বলিল,—"দোহাই তোমার, এখনও আমাকে বাঁচাও। তুমি জান না, তোমাকে না পাইয়া আমি কি অসাধ্য সাধন করিতে বসিয়াছি। কিন্তু তুমি মনে করিলে এখনও আমাকে ফিরাইতে পার। শঙ্কর! দয়া কর—রক্ষা কর। আমার রূপ আছে, যৌবন আছে, হৃদয়ভরা ভালবাসা আছে, সে সমস্তই তোমার পায়ে ঢালিয়া দিতেছি, তুমি একবার ফিরিয়া চাহিবে না কি?"

নির্জ্জন গৃহ, পদতলে যৌবনভরা অলোক-সামান্যা সুন্দরী, সম্মুখে প্রেমপূর্ণ হৃদয়োপহার। কিন্তু এততেও শঙ্করের হৃদয় টলিল না। তিনি দৃঢ়স্বরে কর্কশকণ্ঠে বলিলেন,—"তুমি যদি জগতের সাম্রাজ্য লইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতে, তবে তাহাও আমি পদাঘাতে বিচূর্ণিত করিতাম। এ পাপের ভরা রূপযৌবন লইয়া আর তুমি আমাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিও না।"

পার্ব্বতী স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, —"তুমি পাষাণ।"

শ। তাহা কি এতদিনেও বুঝিতে পার নাই?

পার্ব্বতী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—"বুঝিয়াছি। কিন্তু আর একটা কথা—তুমি কি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর না?"

শ। জীবন দিয়াও রক্ষা করিব।

পা। কিন্তু শঙ্কর! পার্ব্বতীও জীবন দিয়া তাহার প্রতিকূলাচরণ করিবে। প্রত্যাখ্যাতা পদদলিতা পার্ব্বতী প্রাণপণে দেশের সর্ব্বনাশ করিবে। তখন দেখিবে, উপেক্ষিতা পার্ব্বতীর হৃদয়ে কি শক্তি; তখন বুঝিবে, তুমি কি নির্ব্বোধের কার্য্য করিয়াছ।"

পার্ব্বতীর নয়নে প্রতিহিংসার দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। শঙ্কর মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"তুমি এইরূপ ভয় দেখাইয়া কার্য্যসাধন করিবার উদ্দেশেই কি আমাকে এখানে আনিলে?"

পার্ব্বতী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"আইস।"

পার্ব্বতীর পশ্চাৎ শঙ্কর কক্ষ হইতে বাহির হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—(০)—

লালসার জয়।

কবি বলিয়াছেন, "আশাবধিং কো গতঃ"। বাস্তবিকই, আশার বুঝি অবধি নাই। হৃদয়ে একবার আশার একটু ক্ষুদ্র অঙ্কুর উত্থিত হইলে শীঘ্রই তাহা অনন্ত শাখা-পল্লবাবৃত রূপে অসীম হইয়া পড়ে। তখন তাহার প্রতি শাখায় নবীন পল্লব, প্রতি পল্লবান্তরালে নবোদ্গত বিচিত্র কুসুম গুচ্ছ, প্রতি গুচ্ছে ভ্রমর গুঞ্জন, প্রতি শাখায় কোকিল কূজন, আশামুগ্ধ মানবের প্রাণমন অভিভূত ও উন্মাদ করিয়া ফেলে। মানব সেই বিচিত্র নবীন শোভায় মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া যতই তাহার সমীপবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করে, ততই তাহা মরুভূমির কুহকময়ী মরীচিকার ন্যায় আরও উজ্জ্বল আরও মনোহর বেশ ধারণ করিয়া তাহাকে দূর হইতে দূরান্তরে আকর্ষণ করে। কুহক-মুগ্ধ মানব একটা নিদারুণ পিপাসা হৃদয়ে লইয়া অতৃপ্তির পথে উন্মাদ হৃদয়ে কেবল তাহার পশ্চাৎ ছুটিতে থাকে। পূর্ব্বে যাহা তাহার নিকট তৃপ্তির দুর্ল্লভ সুধাসমুদ্র বলিয়া বোধ

হইত, এক্ষণে তাহা পদতলে লুণ্ঠিত হইলেও তাহাকে অতৃপ্তির গরল সিন্ধুজ্ঞানে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দর্শন করে এবং হৃদয়ে নব লালসার তীব্র বহ্নি জ্বালাইয়া ঘোর অশান্তিকে আলিঙ্গনের জন্য ধাবিত হয়। শেষে আজীবন সেই অশান্তির অনলে দগ্ধ হইতে হইতে অনুতাপের প্রবল তাড়না সহ্য করিতে থাকে। এই আশাত্যাগেই শান্তি, আশাত্যাগীই দেবতা।

রামরূপ মানুষ, মানুষের হৃদয় লইয়া সে আশার অতল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছে। কাজেই তাহাকে নিত্য নব রত্নের অন্বেষণে সেই অতলস্পর্শী সমুদ্রের মধ্যে হাবুডুবু খাইতে হইতেছে। যেমন এক একটী রত্ন তাহার হস্তগত হইতেছে, অমনই আর একটী রত্নের উজ্জ্বল দীপ্তি তাহার লালসাময় দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহাকে দুরাশার পথে টানিয়া আনিতেছে। রামরূপ যখন পার্ব্বতীকে পায় নাই, কেবল তাহার অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি দেখিয়াছিল, কেবল তাহার মন্মথশর-সন্ধানতুল্য কটাক্ষ দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছিল, তখন তাহার হৃদয় পার্ব্বতীকে পাইবার জন্য লালায়িত হইয়াছিল, সেই দেবদুর্ল্লভ সৌন্দর্য্যসুধা উপভোগ করিবার জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর যখন সে সেই রূপলাবণ্যময়ী পার্ব্বতীকে হাতে পাইল, যখন দেখিল, সেই অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশি তাহার চরণে বিলুণ্ঠিত, যখন বুঝিল, পার্ব্বতী

এখন তাহার খেলার পুতুল মাত্র, তখন তাহার পূর্ণ হৃদয়ে আর একটা আশার বিরাট তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিল; তখন তাহার চঞ্চল মনোভৃঙ্গ পূর্ণাবয়ব মধ্যাহ্নের পদ্ম ত্যাগ করিয়া বিকাশোন্মুখী ক্ষুদ্র যূথিকাটীর দিকে ধাবিত হইল; তাহার ক্রীড়াশীল হৃদয়হংস বর্ষার কুলপ্লাবিনী স্রোতস্বিনীর উন্মাদ তরঙ্গ ছাড়িয়া শরতের স্বচ্ছসলিলা সরসীতে বিচরণ করিবার জন্য ছুটিল। সে পার্ব্বতীর খরোজ্জ্বল রূপে তৃপ্তি না পাইয়া চন্দ্রার যৌবনোন্মুখ শান্ত সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয় লাভের জন্য উৎসুক হইল; বসন্তের উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন অপেক্ষা শারদ উষার স্নিগ্ধ কান্তি অধিক মনোরম বলিয়া মনে করিল।

রামরূপ এখন কৃষ্ণকান্তের সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা। রণজিৎ রায়ের নিকট কর্ম্মচ্যুত হইয়া সে কৃষ্ণকান্তের বিষয় সম্পত্তি পরিদর্শনে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার চতুরতা, কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতি গুণাবলী দর্শনে পার্ব্বতী তাহাকে আপনার সঙ্কল্পসিদ্ধির প্রধান সহায়রূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং আপনার সর্ব্বস্ব দিয়া তাহাকে মুগ্ধ ও বাধ্য করিয়া ফেলিয়াছিল। এই সকল কারণে রামরূপ এখন বাটীর একজন পরিজন মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। কাজেই সে চন্দ্রাকে লাভ করিবার পক্ষে বিশেষ কিছু বাধা দেখিল না।

এই সময় হইতে রামরূপ কৌশলে চন্দ্রার হৃদয় অধিকার করিতে চেষ্টিত হইল। তাহাতে মাতৃহীনা চন্দ্রা বিমাতার কঠোর শাসন হইতে অনেকটা রক্ষা পাইল। রামরূপ বাহ্য স্নেহ ও করুণার প্রস্রবণ ছুটাইয়া ক্রমে তাহাকে বশ করিতে লাগিল। চেষ্টা সফল হইল। তাহার এই অযাচিত স্নেহ ও মমতার নিকট চন্দ্রা আপনাকে কৃতজ্ঞতার দৃঢ়পাশে আবদ্ধ বলিয়া মনে করিল। কিন্তু হায়, অভাগিনী তখন বুঝিতে পারে নাই যে, এই স্নেহধারার অন্তরালে কি ভীষণ কালফণী অবস্থান করিতেছে। চতুরা পার্ব্বতী ইহা দেখিল, বুঝিল, কিন্তু কিছু বলিল না।

শঙ্কর যখন নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন চন্দ্রা আপনার কক্ষে গবাক্ষ-সমীপে বসিয়া তাহা দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে কত কথা—কত অতীতের স্মৃতি তাহার হৃদয়ে আঘাত করিতেছিল। আজ কতদিন পরে সে শঙ্করকে দেখিল,—সে গুলা দিন নহে, যেন এক একটা যুগ। বাল্যের সহচর, জীবনের বন্ধু, সুখদুঃখের সাথী, প্রাণের আরাধ্য দেবতা শঙ্কর কতযুগ পরে আবার তাহার সম্মুখে আসিলেন। সেই শরতের শান্তপ্রভাত—সেই বিদায়ের দিন,—সেই প্রত্যাখ্যানের কঠোর স্মৃতি সকলই চন্দ্রার মনে পড়িল। সে একবার মনে করিল,—"হায়, কেন সে দিন নির্ম্মম হৃদয়ে

সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম?" কথাটা ভাবিয়া চন্দ্রার হৃদয়ে অনুতাপ আসিল। ভাবিল, "এখন একবার ছুটিয়া গিয়া পায়ে পড়িয়া বলি, "না না, তুমি আসিও।" কিন্তু চন্দ্রা তাহা করিতে পারিল না, সে শক্তি বা সাহস হইল না। তখন সে কেবল শঙ্করের পানে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তারপর শঙ্কর নদীতীর ত্যাগ করিয়া পার্শ্বস্থ পথে অগ্রসর হইলেন। চন্দ্রা আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তখন তাহার ব্যথিত হৃদয় ভেদ করিয়া একটা কাতরতার গভীর দীর্ঘশ্বাস বহির্গত হইল। এবার চন্দ্রা আপনার কথা ছাড়িয়া শঙ্করের সুখদুঃখের ভাবনা ভাবিতে লাগিল। শঙ্করের দুঃখসুখ, শক্তি গৌরব, কীর্ত্তি যুদ্ধ, একে একে সকল কথাই ভাবিল। যুদ্ধের কথা ভাবিতে সে শিহরিয়া উঠিল। হায়, কেন এ কালযুদ্ধ বাধিল? কেন শঙ্কর এই জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্বরূপ ভীষণ মৃত্যু-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন? তখন চন্দ্রার কল্পনানেত্রের সম্মুখে সেই ভীষণ যুদ্ধের ভয়াবহ প্রতিকৃতি জাগিয়া উঠিল। সে সভয়ে দেখিল, যেন দীর্ঘশ্মশ্রুমণ্ডিত রক্তপরিচ্ছদধারী অগণিত মুসলমান সেনা উলঙ্গ কৃপাণহস্তে দণ্ডায়মান, তাহাদিগের ভীমগর্জ্জনে রণস্থল প্রকম্পিত, শোণিত-স্রোতে সমরভূমি পরিপ্লাবিত। সেই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে

শত্রুসৈন্য-পরিবেষ্টিত শঙ্কর একা দণ্ডায়মান; তাঁহার সর্ব্ব-শরীর রুধিরাক্ত, পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্ন, আরক্তিম-লোচনদ্বয় সজল, মুখমণ্ডল ভীতি ও নিরাশার অন্ধকারে ব্যাপ্ত। মুহূর্ত্তে সেই অসংখ্য মুসলমান সৈন্য গর্জ্জিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তে তাহাদের হস্তস্থিত উলঙ্গ কৃপাণশ্রেণী উত্তোলিত হইল, মুহূর্ত্তে শঙ্কর চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"রক্ষা কর, রক্ষা কর।" সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাহীনার ন্যায় চন্দ্রাও কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"কে আছ রক্ষা কর, শঙ্করকে রক্ষা কর।"

"আমি রক্ষা করিব।"

চমকিত হইয়া চন্দ্রা ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রামরূপ বলিতেছে,—"আমি রক্ষা করিব।"

চন্দ্রা উৎফুল্ল স্বরে বলিল,—"পারিবে?"

রামরূপ বলিল,—"পারিব। কিন্তু বল, তুমি আর কাঁদিবে না?"

চন্দ্রা নতমুখে উত্তর করিল,—"না।"

রাম। কিন্তু চন্দ্রা! এ কাজ বড় সহজ নয়, তবে যতই কঠিন হউক, তোমার জন্য আমি ইহা করিব। কিন্তু চন্দ্রা! তুমি কি মনে কর, কখনও শঙ্করকে পাইবে?"

চ। না।

রাম। তবে কেন কাঁদ [illegible]

চ। জানি না।

রাম। শঙ্কর বাঁচিলে তোমার লাভ কি ?

চ। কিছুই না।

রাম। তবে কেন আমি এই দুষ্কর কার্য্যে অগ্রসর হইব ?

চন্দ্রা কাতরদৃষ্টিতে রামরূপের মুখের দিকে চাহিল। রামরূপ বলিল,—"আমি নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিতে পারিব না। আমি কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার চাই।"

চ। আমি দুঃখিনী, আমার কি আছে ?

রামরূপ ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"আমি কি সত্যই তোমার নিকট রাজৈশ্বর্য্য চাহিতেছি ?"

চন্দ্রা একটু লজ্জিত হইল। সে রামরূপের মহত্ত্ব, উদারতা বুঝিতে পারিল, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু পূর্ণ হইয়া গেল। তখন সে ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া রামরূপের পদতলে বসিল। তারপর কাতরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল,—"তুমি মহৎ, উদারহৃদয়; আমার আর কি আছে ? আছে কেবল এই দুঃখময় জীবন; সেই জীবন আমি চিরদিনের জন্য তোমার——"

কথা সমাপ্ত না হইতেই বাহিরে একটা বিকট শব্দ উঠিল। চন্দ্রা ও রামরূপ ব্যস্তভাবে সেই দিকে চাহিল।

রামরূপ যখন চন্দ্রার কক্ষে প্রবেশ করে, তখন পার্ব্বতীর চতুর দৃষ্টি তাহা লক্ষ্য করিল। তাই সে আপনার হৃদয়ের সমস্ত বিষটা উদ্গীরণ করিয়া শঙ্করের হৃদয়ে ঢালিবার অভি-প্রায়ে শঙ্করকে বলিল,—"আইস।"

শঙ্করকে লইয়া পার্ব্বতী প্রফুল্ল অন্তরে চন্দ্রার কক্ষের নিকটে গেল। অতি নিকটে গেল না, যেখানে দাঁড়াইলে কক্ষের সমস্ত দেখা যায়, সকল কথা একটু একটু শুনা যায়, সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। তারপর অবসর বুঝিয়া কক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিল,—"ঐ দেখ।"

শঙ্কর ব্যগ্রদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিলেন। কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, চন্দ্রা রামরূপের পদতলে জানু পাতিয়া বসিয়াছে; শুনিতে পাইলেন, চন্দ্রা বলিতেছে,—"সেই জীবন আমি চিরদিনের জন্য তোমার——"

শঙ্কর আর কিছু শুনিতে পারিলেন না, শুনিবার শক্তিও তাঁহার রহিল না। তিনি উন্মাদের ন্যায় বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"যাদুকরি!"

শঙ্কর পার্ব্বতীকে ঠেলিয়া দিয়া কম্পিতপদে সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইলেন। পার্ব্বতী খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

———

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সহধর্ম্মিণী।

পরদিন সংবাদ আসিল, ফৌজদার সাহেব চারি হাজার সৈন্য ও দুইটা কামান লইয়া সজ্জিত হইতেছে, শীঘ্রই আক্রমণ করিবে। তখন শঙ্কর সৈন্যসজ্জায় মনোনিবেশ করিলেন, রূপনাথ সে কার্য্যে লিপ্ত না হইয়া কেবল পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

আক্রমণের কথাটা শীঘ্রই গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমে তাহা অতিরঞ্জিত ভাবে চারিদিকে আলোচিত হইতে লাগিল। চারি হাজার সৈন্য ক্রমে মুখে মুখে সাত হাজার হইল, সাত হাজার হইতে দশ হাজারে উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে দুইটা কামানও দশটায় পরিণত হইয়া গ্রামে প্রচারিত হইল। গ্রামবাসী গৃহস্থগণের ভয়ের সীমা রহিল না।

কথাটা ঘুরিয়া ফিরিয়া কমলার মাতার কর্ণে আরও একটু অতিরঞ্জিত ভাবে প্রবেশ করিল। দশ হাজার সৈন্য দশটা কামান ছাড়া তিনি গোপনে আরও শুনিলেন যে,

ফৌজদার ঘোষণা করিয়াছেন, যে রূপনাথের মাথাটা আনিতে পারিবে, সে দুই হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে। শুনিয়া কমলার মাতা ভয়ে শুকাইয়া গেলেন। তিনি তখন বাটীতে গিয়া কন্যাকে বলিলেন,—"এ সব কি শুন্‌ছি?"

কমলা বলিল,—"কি মা?"

ক-মা। তোকে কতদিন বলেছি, বামুনের ছেলে জপ জপ করুক, আপনার সংসারধর্ম্ম দেখুক; তা নয়, কেবল লড়াই আর লড়াই।

ক। তাতে হয়েছে কি?

ক-মা। হবে আর কি? বামুনের ছেলের কি এ সব সয়? দিন নাই রাত নাই, ঘর সংসার ফেলে কেবল মার্ মার্, কাট্ কাট্। এ সব ছোট লোকের কাজ কি বামুনের সয়?

ক। কি হয়েছে তাই ভেঙ্গেই বল না?

ক-মা। হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। আমার তো আর মরণ নাই, তাই সব ছেড়ে এখানে এই সব দেখ্‌তে এসেছি।

কমলা মাতার স্বভাব জানিত। সে আর কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। তখন তাহার মাতা কতকগুলা আক্ষেপের পর অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে শ্রুতকাহিনী সমূহ একে

একে কন্যাকে বলিলেন। শুনিয়া কমলা মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু বাহিরে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিল,—"তার আর কি হয়েছে মা! যুদ্ধ করিতে গেলেই মরিতে হয়, এতো আর নুতন কথা নয়।"

মাতা বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"অনেক মেয়ে দেখেছি, কিন্তু তোর মত পাহাড়ে মেয়ে আর দুটী নাই।"

কমলা ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"কি করি মা, যেমন দেশ, তেমনই চল্‌তে হবে। পাহাড়ে মেয়ে না হ'লে সে দিন কি মান প্রাণ বাঁচিয়ে আস্‌তে পারতাম?"

মাতা ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—"তাই বলে কি চিরকালটা খাঁড়া হাতে সেই সেই করে নাচ্‌তে হবে? দেখ্‌, বুড়ীর কথা শোন্‌, এখনও জামাইকে বারণ কর, বুঝিয়ে শুঝিয়ে ফেরা। দাঙ্গা হাঙ্গাম ছেড়ে বামুনের ছেলে আপনার সংসারধর্ম্ম করুক।"

ক। তুমি কি মনে কর মা, আমি বারণ করি না। বারণ করি, কিন্তু তিনি পুরুষ মানুষ, আপনার বল বুঝেন। তিনি কি আর আমার কথায় চুপ করে ঘরে বসে থাক্‌বেন?

ক-মা। তুই যদি মেয়ের মত মেয়ে হতিস্‌, তবে তার বাপকে থাকৃতে হতো।

ক। কিন্তু মা, তা আমি পারবো না।

ক-মা। তাতো আমি জানি; যেমন দেবা তেমনি দেবী। সে রণভৈরব, আর তুই রণচণ্ডী; কেবল ভেবে মরি আমি।

ক। তুমি কেন ভাব মা?

ক-মা। আমি পোড়াকপালী যে ঐ মা হয়েই মরেছি। তা নইলে আর আমার ভাবনা কিসের? তোকে পেটে ধরেছি বলেই তো আমার এই ছটফটানি। তোদের পায়ে একটা কাঁটা ফুটবে, সেটা আমার বুকে শেলের মত বিঁধবে। তাই একবার না শুনলেও আমি পাঁচবার বলি। যম আমায় ভুলে রয়েছে, তাই তোদের জ্বালাতন করি।

মাতার নয়নে অভিমানের অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। কমলা তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল,—"রাগ কোরো না মা, এবার ভাল করে বল্‌ব।"

মাতা আর কিছু বলিলেন না, তিনি নয়নে অঞ্চল চাপিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। তখন কমলা মনে মনে বলিল,— "দেবতার কার্য্যে এ আবার কি বাধা ঠাকুর?"

তিন দিন পরে রূপনাথ গৃহে ফিরিলেন। তখন কমলা তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিল। শুনিয়া রূপনাথ একটু হাসিয়া বলিলেন,—"কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। তবে দশহাজার সৈন্য

নহে, প্রায় চারি হাজার হইবে, আর কামানও দশটা নহে, দুইটা। মাথার পুরস্কারের কথাটা বোধ হয় সমস্তই মিথ্যা।"

কমলা বলিল,—"মাতো শুনে অবধি কাঁদাকাটা করছেন।"

রূপনাথ বলিলেন,—"কাঁদিবার কথা বটে, কিন্তু তুমি কি বল কমলা?"

কমলা বলিল,—"আমার আর বলিবার কি আছে? তোমার কার্য্য তুমি করিবে, আমি তাহাতে বাধা দিবার কে? তবে মার চোখে জল দেখ্‌লে বড় কষ্ট হয়।"

রূপ। উপায় থাকিলে মার কষ্ট নিবারণ করিতাম, কিন্তু এখন আর উপায় নাই। এই যুদ্ধটা শেষ হইলেই মাকে যেরূপে হউক কাশী পাঠাইয়া দিব।

ক। এখন কি আর যুদ্ধ ভিন্ন উপায় নাই?

রূপ। না, আমি যুদ্ধ ত্যাগ করিলেও তুমি কি মনে কর, ফৌজদার আমাকে ছাড়িয়া দিবে? কখনই না। তবে কমলা! ফৌজদারের শূলে মরার অপেক্ষা দেশের জন্য যুদ্ধ করিয়া মরা ভাল নয় কি?

ক। সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তোমার ভালমন্দ তোমার অপেক্ষা কি আমি বেশী বুঝি? আমি কেবল জানি, তুমি আমাকে মরিতে বারণ করিয়াছ, তাই এখনও বাঁচিয়া আছি; যেদিন বলিবে, সেইদিন মরিব।

রূপনাথ নীরবে রহিলেন। মনে মনে বলিলেন, "হায় কমলা! তোমার নারীহৃদয়ে যে শক্তি যে সাহস আছে, দুর্ভাগ্য বাঙ্গালার পুরুষ-হৃদয়ে তাহার এক কণাও দেখিতে পাই নাই কেন? এই পরপদাহত লাঞ্ছিত জাতি মরিতে এত ভয় করে কেন? অর্দ্ধমৃত বাঙ্গালীর বাঁচিতে এত সাধ কেন?"

কমলা বলিল,—"তোমাদের কত সৈন্য আছে?"

রূপ। দুই হাজার।

ক। এই দুই হাজার সৈন্য লইয়া কিরূপে চারি হাজার সিপাহীকে পরাজয় করিবে?

রূপ। কুরুক্ষেত্রে দুর্য্যোধনের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত যুদ্ধে পাণ্ডবগণের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা কিরূপে জয়লাভ করিল কমলা?

ক। কৃষ্ণ, পাণ্ডবগণের সহায় ছিলেন।

রূপ। কৃষ্ণ, পাণ্ডবগণের সহায় ছিলেন না, কৃষ্ণ ধর্ম্মের সহায় ছিলেন। যেখানে ধর্ম্ম সেই খানে কৃষ্ণ, যেখানে ন্যায় সেই খানে কৃষ্ণ, যেখানে সত্য সেই খানে কৃষ্ণ। আর যেখানে কৃষ্ণ সেই খানেই জয়। তবে ভয় কি কমলা?

কমলা আর কোন উত্তর করিল না। রূপনাথ ধীরে ধীরে বাহিরে গেলেন। কমলা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল,

"যেখানে সত্য সেই খানে কৃষ্ণ, যেখানে কৃষ্ণ সেই খানে জয়। তবে ভয় কি?"

হায় কমলা! ইহাই কি তোমার স্বামীকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করা? অথবা তুমি রূপনাথের সহধর্ম্মিণী। কিন্তু তোমার ন্যায় রমণী আর কি বাঙ্গালায় আসিবে না?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

——০ঃ*ঃ০——

সন্ধিপূজা।

যুদ্ধারম্ভের দুই দিন পূর্ব্বে রূপনাথ নবপ্রতিষ্ঠিত শঙ্করপুর গ্রামে একটা মেলা বসাইলেন। অনেকেই এরূপ সময়ে মেলার আয়োজন দেখিয়া বিস্মিত হইল। মেলা দেখিবার জন্য নানাস্থান হইতে দর্শকবৃন্দ দলে দলে আসিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে স্ত্রী, বালক বা বৃদ্ধ একজনও ছিল না। তাহারা সকলেই বলিষ্ঠ, সাহসী ও উদ্যমশীল যুবক। রূপনাথ পূর্ব্ব হইতেই দর্শকদিগের জন্য বাসস্থান ও আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মেলায় যে দর্শনযোগ্য এমন কিছু ছিল তাহা নহে, তথাপি দিবারাত্রি দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। কিন্তু তথা হইতে কেহ ফিরিল না। কেবল দুই একজন সুচতুর ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই এই অসাময়িক উৎসবের কারণ বুঝিতে পারিল না। দ্বিতীয় দিবসের সন্ধ্যাকালে দর্শকের আগমন সংখ্যা কিছু কমিল।

তৃতীয় দিবসের প্রাতঃকালে রস্তম আলি প্রায় চারি হাজার

সৈন্যসহ গ্রামপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, এই সৈন্যশ্রেণী লইয়া তিনি একেবারে দেবীগড়ার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবেন, গ্রামখানাকে পদদলিত করিয়া একেবারে ধ্বংসের মুখে প্রেরণ করিবেন। সেইরূপ বাসনা ও উৎসাহ লইয়াই তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু পূর্ব্ব দিবসের রাত্রিতে কৃষ্ণকান্ত গিয়া তাঁহার এ শুভ ইচ্ছায় বাধা দিলেন। তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, শঙ্করপুর গ্রামখানা কেবল পাইক সৈন্যে পরিপূর্ণ। একেবারে অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করিলে তাহারা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবে।

রস্তম আলি হাসিয়া বলিলেন,—"একখানা ছোট গ্রামে কয়টা লোক আছে? আমার চারি হাজার সৈন্য।"

কৃষ্ণকান্ত বিশদরূপে তাঁহাকে মেলার ব্যাপারটী বুঝাইয়া দিলেন। শুনিয়া রস্তম আলি বলিলেন,—"তবে আগেই শঙ্করপুর ধ্বংস করিব।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—"তাহা হইলে আক্রমণকালে শঙ্করের সৈন্য পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিবে।"

রস্তম আলি বলিলেন,—"সে দিকে একটা কামান থাকিবে।"

ফৌজদার সাহেবের যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞতা দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত মনে মনে হাসিলেন। তিনি তখন পার্শ্বদেশ হইতে

শত্রুর আক্রমণ যে কিরূপ ভয়ঙ্কর এবং তাহা যে কেবল একটা কামানের সহায়ে রোধ করা অসম্ভব, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। রণকৌশলানভিজ্ঞ গর্ব্বোদ্ধত রস্তম আলি তাহা না বুঝিলেও তাঁহার অধীনস্থ সেনানায়ক জনাব আলি বুঝিতে পারিলেন। তখন অনেক পরামর্শের পর উভয় দিক হইতে দূরে থাকিয়া যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, ইহাই স্থির হইল।

পরদিন সেই ভাবেই আক্রমণ করা হইল। সম্মুখে দেবীগড়া এবং দক্ষিণে শঙ্করপুর গ্রাম যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অর্দ্ধ-ক্রোশ দূরবর্ত্তী রহিল। বামপার্শ্বে কিছু দূরে ক্ষুদ্র জঙ্গলাবৃত একখানা গ্রাম, পশ্চাতে ক্রোশব্যাপী উন্মুক্ত প্রান্তর। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ব্যূহ সজ্জিত হইল, ব্যূহের বাম ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে দুইটী কামান স্থাপিত হইল। সেই সুসজ্জিত সৈন্যশ্রেণী দর্শনে শঙ্কর বুঝিলেন, এইবার ভাগ্যপরীক্ষা, হয় উত্থান নয় পতন।

কিন্তু শঙ্কর এজন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। তিনিও সশস্ত্র দ্বিসহস্র সৈন্য লইয়া শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হইলেন। উভয়পক্ষ পরস্পরের সম্মুখবর্ত্তী হইল, উভয় পক্ষই স্ব স্ব বন্দুক তুলিয়া আক্রমণোদ্যত হইল। তখন হিন্দুসৈন্যমণ্ডলী হইতে সেই রণপ্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত করিয়া দ্বিসহস্র কণ্ঠে নিনাদিত হইল,—"জয় জগদীশ হরে!" সঙ্গে সঙ্গে "আল্লা

হো আকবর” শব্দে বিপক্ষপক্ষ গর্জন করিয়া উঠিল। উভয়শব্দে দিগন্ত কাঁপিয়া উঠিল।

তারপর অনবোদপোরী আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জ্জন, অস্ত্রের ঝনৎকার, বাদ্যের হুঙ্কার, আহতের আর্ত্তনাদ মিলিত হইয়া এরূপ এক ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। সেই ক্ষুদ্রান্তো পীলাস্থলে উন্মত্ত সৈন্যগণ সংহারমূর্ত্তিতে বিচরণ করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে কেবল গগন বিদীর্ণ করিয়া শব্দ উঠিতে লাগিল,—“জয় জগদীশ হরে!”

ক্রমে যুদ্ধস্থল আরও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল। বিপক্ষপক্ষ হইতে কামানের জ্বলন্ত গোলা আসিয়া হিন্দু সৈন্যের উপর পড়িতে লাগিল। সেই অগ্নিবৃষ্টিতে দলে দলে হিন্দুসৈন্য পড়িল। কিন্তু ইহাতে তাহারা কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হইল না বা একপদও পশ্চাতে হটিল না। পশ্চাৎ হইতে নূতন সৈন্য আসিয়া আহতের স্থান সম্পূরণ করিতে লাগিল। বিপক্ষপক্ষ দ্বিগুণ উৎসাহে তাহাদিগের উপর গোলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। হিন্দুপক্ষ হইতেও ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসিয়া তাহাদিগকে ধরাশায়ী করিতে লাগিল।

এইরূপে সমস্ত দিন যুদ্ধ চলিল। যুদ্ধে উভয় পক্ষেই অনেক লোক হতাহত হইল। ক্ষতিটা হিন্দুপক্ষেই অধিক। ক্রমে যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রান্তর আচ্ছন্ন হইল, তখন

সে দিনের মত যুদ্ধ স্থগিত হইল। রণক্লান্ত সৈন্যগণ এক রাত্রির জন্য বিশ্রাম লাভের অবসর পাইল। কিন্তু আজিকার যুদ্ধে রূপনাথকে কেহ দেখিতে পায় নাই। এদিকে যখন ভীষণ মৃত্যুক্রীড়া চলিতেছিল, তখন রূপনাথ শঙ্করপুরে উৎসবের আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন। তারপর যখন যুদ্ধ শেষ হইল, যখন নিশার ঘোর অন্ধকারে নির্জ্জন রণক্ষেত্র হইতে আহতের ক্ষীণ আর্ত্তনাদ উঠিয়া শূন্যে মিলাইয়া যাইতে লাগিল, তখন কয়েকজন অনুচরের সহিত রূপনাথ সেই শবরাশি-সমাচ্ছন্ন রণভূমিতে প্রবেশ করিলেন। তারপর আলোক হস্তে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া শত্রুমিত্র উভয় পক্ষে আহত-গণের অন্বেষণে ব্যাপৃত হইলেন। বহু পরিশ্রমের পর আহত ও মুমূর্ষু সৈনিকগণকে সঙ্গে লইয়া শঙ্করপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে সকলকে রক্ষা করিয়া তাহাদের শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই যত্নে ও সেবায় আহত শত্রুপক্ষীয়গণ বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইল; মুমূর্ষুগণ মুহূর্ত্তের জন্য মৃত্যুযন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া শেষ নিশ্বাস টানিতে টানিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, তারপর ক্ষীণকণ্ঠে আল্লাকে ডাকিয়া চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিল।

রাত্রিশেষে যখন সৈন্যগণ পুনর্ব্বার যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত

হইতেছে, রূপনাথ তখনও আহত যন্ত্রণাকাতর সৈনিকগণের পার্শ্বে বসিয়া জয়দেবের সুধাসমুদ্র উদ্বেলিত করিতে করিতে মধুর কণ্ঠে গাহিতেছেন,—

"শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল এ,
কলিত ললিত বনমাল, জয় জয় দেব হরে।
দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন এ,
মুনিজনমানসহংস, জয় জয় দেব হরে।
কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন এ,
যদুকুলনলিনদিনেশ, জয় জয় দেব হরে।
মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন এ,
সুরকুলকেলিনিদান, জয় জয় দেব হরে।
অমলকমলদললোচন ভবমোচন এ,
ত্রিভুবনভবননিধান, জয় জয় দেব হরে।
জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ এ,
সমরশমিতদশকণ্ঠ, জয় জয় দেব হরে।
অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর এ,
শ্রীমুখচন্দ্রচকোর, জয় জয় দেব হরে।
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় এ,
কুরু কুশলং প্রণতেষু, জয় জয় দেব হরে ॥"

সঙ্গীতের তরঙ্গে তরঙ্গে সুধাবৃষ্টি হইতেছে, মৃদুবায়ু-

প্রবাহে তাহা দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতেছে, নৈশগগনে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিতেছে। আর আহত মুমূর্ষু সৈনিকগণ মধুর কণ্ঠ-নিঃসৃত সেই সুধাধারা পান করিতে করিতে ভীষণ মৃত্যুযন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া চিরশান্তির কোমল অঙ্কে ঢলিয়া পড়িতেছে। সেই শান্তিধামে অনন্তের পথে দাঁড়াইয়াও তাহারা যেন অনন্তকণ্ঠের প্রতিধ্বনি শুনিতেছে,—"জয় জয় দেব হরে!"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—(০)—

প্রতিহিংসা।

পরদিন প্রভাতে আবার রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ সমবেত হইয়া আবার পরস্পরকে আক্রমণ করিল। কিন্তু কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরই হিন্দুসৈন্যগণ ক্রমেই হীনবল হইয়া পড়িতে লাগিল, বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত কামানের ভীষণ অগ্নিবৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা পশ্চাতে হটিল। এবার বিপক্ষগণ আরও উৎসাহিত হইয়া দ্বিগুণ বিক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। সেই ভীম আক্রমণে হিন্দুসৈন্যগণ ক্রমেই পশ্চাতে হটিতে লাগিল, বিপক্ষগণও ক্রমেই অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে নিহত করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে আক্রমণ করিতে করিতে উৎসাহদৃপ্ত বিপক্ষগণ যখন অনেক দূর অগ্রসর হইয়া আসিল, তখন হিন্দুসৈন্যগণ সহসা একবার অটল পর্ব্বতবৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইল। ইহা দেখিয়া বিপক্ষগণ একটু বিস্মিত হইল। মুহূর্ত্ত পরেই

তাহারা আবার ভীমবেগে অগ্রসর হইয়া শত্রু বিনাশে উদ্যত হইল। তখন সেই স্থির হিন্দুসৈন্যমণ্ডলী হইতে অগ্রগামী হইয়া আবদুল চীৎকার করিয়া বলিল,—"কে মরিতে পার আইস।" কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আবদুল বিপক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ কামান লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে ছুটিল, পশ্চাতে আরও কয়েকজন সৈন্য মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া তাহার অনুসরণ করিল।

কিয়দ্দূর না যাইতেই ভীমরবে কামান গর্জ্জিল, সঙ্গে সঙ্গে একটা জ্বলন্তগোলা আসিয়া অগ্রগামী সৈন্যগণের মধ্যে পড়িল। তৎক্ষণাৎ দুইজন সৈন্য ধরাশায়ী হইল, কয়েকজন ভীত হইয়া পশ্চাতে হটিল, কেবল দুইজন মাত্র সৈন্য আবদুলের পশ্চাৎ ছুটিল। উভয় পক্ষই বিস্মিত দৃষ্টিতে এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে লাগিল। দ্বিতীয়বার কামান গর্জ্জনের পূর্ব্বেই আবদুল নক্ষত্রগতিতে গিয়া কামানের নিকট উপস্থিত হইল। সেখানে পাঁচজন সৈন্য দাঁড়াইয়া কামান দাগিতেছিল। আবদুল উপস্থিত হইয়াই তরবারির আঘাতে একজনকে ধরাশায়ী করিল। অমনই চারি খানা অসি তাহার মস্তকের উপর উত্থিত হইল। পশ্চাদাগত সৈন্যদ্বয় উপস্থিত হইয়া তাহাদের দুইজনের শিরশ্ছেদন করিল, আবদুলের তরবারিও একজনের উপর পড়িল।

অবশিষ্ট একখানা তরবারি বাধা প্রাপ্ত হইয়াও আবদুলের স্কন্ধে পড়িল, কিন্তু তাহাতে আঘাত সামান্যই লাগিল। আবদুল সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া আঘাতকারীকে ধরাশায়ী করিল। দূর হইতে এই ব্যাপার দেখিয়া কয়েকজন মোগলসৈন্য সেই দিকে ছুটিল। কিন্তু তাহাদের আসিবার পূর্ব্বেই কামানের মুখ ফিরিয়া গেল। এবার মুসলমান-সৈন্যকে লক্ষ্য করিয়া ভীমরবে কামান গর্জ্জিল। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাৎ হইতে শব্দ উঠিল,—"জয় জগদীশ হরে!" বিস্মিত স্তম্ভিত বিপক্ষ-সৈন্যগণ ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, পশ্চাতে পিপীলিকাশ্রেণীবৎ দলে দলে পাইক সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। বিপক্ষগণ প্রমাদ গণিল।

তখন উভয় দিক হইতে শঙ্কর ও রূপনাথ ঝাঁপাইয়া পড়িয়া শত্রুসৈন্য নিষ্পেষিত করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া যুদ্ধত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নের জন্য ব্যস্ত হইল। কিন্তু দক্ষিণদিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই বাধা পাইল। সে দিকে আবদুল দাঁড়াইয়া ঘন ঘন গোলা বর্ষণ করিতেছে, শতাধিক সৈন্য কামানের মুখ রক্ষা করিতেছে। সে দিকে বাধা পাইয়া বিপক্ষগণ বামদিকে ছুটিল। অমনই বামপার্শ্বস্থ জঙ্গলাবৃত গ্রাম হইতে শত শত পাইক সৈন্য বাহির হইয়া তাহাদিগের

উপর পড়িল। বিপক্ষগণ হতাশ্বাস হইয়া সে দিক হইতেও ফিরিল। এবার তাহারা জীবনের মমতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত ফিরিয়া দাঁড়াইল। আর একবার "আল্লা হো আকবর" রবে দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া সিংহবিক্রমে শত্রুবিনাশে প্রবৃত্ত হইল। সে আক্রমণের বেগে হিন্দুসৈন্য অস্থির হইয়া উঠিল। তখন রূপনাথ সেই ক্ষুব্ধসাগরবৎ সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন,— "জয় জগদীশ হরে!" অমনই গগন বিদীর্ণ করিয়া চারিদিক হইতে শব্দ উঠিল, "জয় জগদীশ হরে!" হিন্দুগণ আবার প্রবল উৎসাহের সহিত শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করিতে লাগিল।

মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত প্রবলভাবে যুদ্ধ চলিল। তাহার পর চতুর্দ্দিকের ভীষণ আক্রমণে বিপক্ষদল ক্রমেই হীনবল হইয়া পড়িতে লাগিল। তথাপি তাহারা দুর্দ্ধর্ষ মোগল বীর্য্য স্মরণ করিয়া যুদ্ধত্যাগ করিল না। তারপর যখন একে একে অর্দ্ধাধিক সৈন্য ধরাশায়ী হইল, তখন সেনানায়ক জনাব আলি বাধ্য হইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। অনর্থক সৈন্যক্ষয় অবিধেয় বোধে তিনি রূপনাথের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। রূপনাথ শত্রুগণের কামান বন্দুক প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। সন্ধ্যার ক্ষীণ অন্ধকারে গা ঢাকিয়া রুস্তম আলি দেড় সহস্র মাত্র

সৈন্য সঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে হিন্দু-সৈন্যগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

এবার পরাজিত অপমানিত রস্তম আলি সম্মুখ আক্রমণে সাহসী না হইয়া গুপ্তভাবে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি রণজিৎ রায়ের জমিদারীর প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার করিয়া পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে স্থির করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিয়া ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিল। তাহারা প্রজাগণের গৃহ লুণ্ঠন করিল, গ্রাম জ্বালাইয়া দিল, সতীর সতীত্ব নাশ করিতে লাগিল। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। তখন শঙ্কর এক সহস্র সৈন্য লইয়া রাজনগর আক্রমণ করিলেন। সে আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া রস্তমআলি রাজনগর ত্যাগ করিলেন। শঙ্কর ইহাতেই নিবৃত্ত হইলেন না, তিনি সৈন্য সহ ফৌজদার সাহেবের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। রস্তম আলি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়া আশ্রয় লইলেন, শঙ্কর সেই খানে গিয়াই তাঁহাকে তাড়া করিতে লাগিলেন। এইরূপে পশ্চাত্তাড়িত হইয়া রস্তমআলি দামোদর নদ পার হইলেন। শঙ্করও নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিলেন।

দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইল, অত্যাচার, অবিচার দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। প্রজাগণ বহুকাল পরে আবার কিছু

দিনের জন্য স্বাধীনতা সুখ উপভোগ করিতে করিতে শান্তির সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করিবার অবসর পাইল। ইহার পর রূপনাথ রণজিৎ রায়কে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সকলেই তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইল; কেবল কৃষ্ণকান্ত তাহা স্বীকার করিলেন না। আবদুল তাঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া স্বীকার করাইতে চাহিল, কিন্তু রূপনাথ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন,—"বাঙ্গালী বাঙ্গালীর উপর অত্যাচার করিলে এ রাজ্য টিকিবে না।"

আবদুল বলিল,—"কিন্তু এই বাঙ্গালীই শেষে সর্ব্বনাশ করিবে।"

রূপনাথ বলিলেন,—"বাঙ্গালী বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ করিলে তুমি আমি কি করিতে পারি আবদুল?"

আবদুল বলিল,—"আগে হইতেই সাবধান হইলে হয় না?"

রূপনাথ বলিলেন,—"না আবদুল, তাহা হয় না। তাহা হইলে অনেক কৃষ্ণকান্তকে ধ্বংস করিতে হয়।"

আবদুল ক্রুদ্ধস্বরে বলিল,—"তবে এত করিয়া এমন সোণার রাজ্য গড়িতেছ কেন ঠাকুর?"

রূপনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"কে গড়ে আবদুল?

যাঁহার খেলা ঘর, তিনিই গড়িতেছেন, আবার ইচ্ছা হইলে তিনিই ইহা ধ্বংস করিবেন। তুমি আমি গড়িবার ভাঙ্গিবার কে আবদুল?”

এ কথার উত্তর আবদুল কি দিবে? সে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন রূপলাল ঊর্দ্ধে চাহিয়া যুক্তকরে বলিলেন,—“ঠাকুর! তোমার সাধ হইয়াছে, তাই এই সোণার রাজ্য গড়িতেছ; আবার তোমার ইচ্ছাতেই ইহা একদিনে ধূলিসাৎ হইবে। আমি তাহার কি করিতে পারি? সংসারের এই ক্ষুদ্র বালুকাকণা তোমার সেই বিরাট্‌ সৃষ্টিলয়-শক্তির কি সহায়তা করিবে? একবিন্দু বারি দ্বারা অনন্ত সাগরের কি হ্রাসবৃদ্ধি হইবে? তোমার মহীয়সী ইচ্ছার নিকট ক্ষুদ্র মানব আমি কে?”

নব যৌবন।

তৃতীয় খণ্ড।

বিসর্জ্জন।

"তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ো সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন! ॥
প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥"

(গীতা ৬। ৪৩, ৪৫।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

——•:):*:(:•——

অভিমান ও স্নেহ।

প্রণয়ে অবিশ্বাসের তুল্য মনুষ্যের দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কিছুই নাই। যে ধৈর্য্যশালী ব্যক্তি সংসারের শত যন্ত্রণা অকাতরে বুক পাতিয়া সহ্য করিতে পারে, সেও এই প্রণয়ে সন্দেহ—ভালবাসায় অবিশ্বাস দেখিয়া একেবারে কাতর হইয়া পড়ে, তাহার চিরসহনক্ষম হৃদয় এই কঠোর আঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার মত সংসারের নির্ম্মম কষাঘাত বুঝি আর কিছুই নাই। সংসারের অবলম্বন, বার্দ্ধক্যের সহায় একমাত্র পুত্ররত্নে বঞ্চিত হইয়া কয়জন জনকজননী আত্মহত্যা করিয়াছে? সুখদুঃখসঙ্গিনী হৃদয়ানন্দ-দায়িনী প্রণয়িনীকে অকালে কালের হস্তে ডালি দিয়া কয়জন পুরুষ মৃত্যুর করাল গ্রাসে আত্মসমর্পণ করিয়াছে? ধূর্ত্তের প্রবঞ্চনায়, প্রবলের কঠোর অত্যাচারে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া কয়জন মানব সংসার হইতে চিরবিদায় লইয়াছে? কিন্তু যে একবার হৃদয় ঢালিয়া ভালবাসিয়াছে, আপনার সর্ব্বস্ব দিয়া প্রণয়ের

পূজা করিয়াছে, সে যদি সেই ভালবাসার প্রতিদানে এত-টুকুও অবিশ্বাসের রেখা দেখিতে পায়, সেই প্রণয়ের মহা-পূজায় একটু অঙ্গহানি দর্শন করে, তবে তাহার সমস্ত ধৈর্য্য, সমস্ত সুখ, সমস্ত শক্তি একমুহূর্ত্তে কোথায় উধাও হইয়া যায়, সন্দেহের একটা বিকট ছায়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া সে উন্মাদের ন্যায় চিরবিস্মৃতির গর্ভে আত্মগোপন করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। তাহার মত দুঃখী সংসারে আর নাই।

শঙ্কর এখন বড় দুঃখী। তাঁহার আশা গিয়াছে, আনন্দ গিয়াছে, সুখ গিয়াছে, আছে কেবল নিদারুণ যন্ত্রণাকাতর শূন্য প্রাণ। চন্দ্রাকে তিনি হৃদয় ঢালিয়া ভালবাসিয়াছিলেন, নিভৃত মানসসিংহাসনে তাহার চিরানন্দময়ী মূর্ত্তিখানি বসাইয়া কল্পনার আনন্দময় রাজ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, তৃপ্তির অমৃতধারা পান করিয়া কণ্টকিত সংসারপথে নির্ভয়ে অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু যে দিন তিনি রামরূপের পদতলে বসিয়া চন্দ্রাকে হৃদয়-সমর্পণ করিতে দেখিলেন, যে অশুভলগ্ন হইতে তাঁহার প্রণয়ে সন্দেহ আসিল, ভালবাসায় দৃঢ় অবিশ্বাস হইল, সেই দিন—সেই মুহূর্ত্ত হইতে তিনি সকল সুখ, সকল আনন্দ, সকল আশায় বঞ্চিত হইলেন। রহিল কেবল ভালবাসার তীব্র কষাঘাত, নিরাশার উচ্চ হাহাকার, ব্যথিত যন্ত্রণা-পীড়িত জীবন। এখন তাঁহার দৃষ্টিতে সংসার

মরুভূমি, লোকালয় স্তব্ধ শ্মশান, আনন্দের কলধ্বনি কঠোর আর্ত্তনাদ।

শঙ্কর যদি আপনার জীবন-তরণীর স্বাধীন কর্ণধার হইতেন, তবে তিনি কোন্‌দিন তাহাকে নিরাশ-বাত্যাবিক্ষুব্ধ বিস্মৃতির অতলগর্ভে ডুবাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। কিন্তু এখন তিনি স্বাধীন নহেন, রূপনাথ এখন তাঁহার পরিচালক। তাই তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই দুর্ভর জীবনভার বহনে বাধ্য হইলেন, এবং রূপনাথের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়াই যন্ত্র-পরিচালিত পুত্তলিকার ন্যায় কর্ত্তব্যের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। উত্তাল তরঙ্গমালাময় কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া তিনি স্মৃতির—সন্দেহের সবিষ দংশনজ্বালা ভুলিতে চেষ্টা করিলেন।

শঙ্কর একটা বিষয়ে বড় সাবধান হইলেন। তাঁহার হৃদয়ের নিদারুণ যন্ত্রণা, প্রাণের কাতর হাহাকার কাহাকেও শুনিতে দিলেন না, রূপনাথকেও না। তিনি কেবল অগ্নিগর্ভ শমীর ন্যায় আপনার হৃদয়বহ্নিতে আপনিই নীরবে পুড়িতে লাগিলেন। সে অগ্নির তীব্রশিখা কেহ দেখিল না, সে দহনের মর্ম্মকাতরতা কেহ শুনিতে পাইল না। সকলেই তাঁহার একটা দৈহিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল; কিন্তু পরিবর্ত্তনের কারণ কিছুই খুঁজিয়া পাইল না।

সকলের নিকট হৃদয়ভাব গোপন করিলেও একজনের নিকট শঙ্কর ধরা পড়িলেন। সে আবদুল; প্রভুভক্ত আবদুল প্রভুর হৃদয়ভাব সম্পূর্ণ লক্ষ্য করিল। সে বুঝিল, প্রভুর হৃদয়ে একটা তুমুল ঝটিকা উত্থিত হইয়াছে। কিন্তু সেই ঝটিকার উৎপত্তি স্থান কোথায়, তাহা বেশ বুঝিতে পারিল না। তবে কৃষ্ণকান্তের বাটীর নিকট হইতেই যে ঝড়ের বেগটা উঠিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু অনেক অনুসন্ধানেও আবদুল ঝটিকার মূল কারণটা ঠিক করিতে পারিল না। সে তখন যে দিক হইতে ঝড় আসিয়াছে, সেই দিক্‌টায় একটু খরদৃষ্টি রাখিল।

আবদুল দেখিত, স্তব্ধ নিশীথে জগৎ যখন সুষুপ্ত, তখন শঙ্কর একা বাটীর বাহির হইতেন, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণকান্তের বাটীর সম্মুখে নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইতেন। তারপর স্থির দৃষ্টিতে সম্মুখস্থ অট্টালিকার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সে দিক হইতে মুখ ফিরাইতেন। অমনই তাঁহার বদন রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিত, ভ্রূ কুঞ্চিত হইত, নয়নদ্বয় জ্বলিয়া উঠিত, দন্তে ওষ্ঠ নিষ্পেষিত হইতে থাকিত, হস্তদ্বয় দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হইত। তখন তিনি উভয় হস্তে বক্ষ চাপিয়া উন্মাদের ন্যায় অধীর পদক্ষেপে সে স্থান হইতে ছুটিয়া পলাইতেন। কখনও বা শান্ত সুন্দর প্রভাতে একা গিয়া নদীকূলে

বসিতেন, বসিয়া বসিয়া উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া নীরবে রোদন করিতেন, অশ্রুধারায় তাঁহার পরিচ্ছদ সিক্ত হইত। তারপর সেখান হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে অন্য দিকে চলিয়া যাইতেন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আবদুল বড় অস্থির হইয়া পড়িল। এক একবার তাহার ইচ্ছা হইত, প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িয়া তাঁহার হৃদয়ের ব্যথাটা জানিয়া লইবে। কিন্তু তাহার এতটা সাহস হইত না। তাই সে কেবল সতর্ক দৃষ্টিতে প্রভুর গতিবিধি লক্ষ্য করিত।

এইরূপে যখন শঙ্করের অসহ্য দিনগুলা নীরবে কাটিয়া যাইতেছিল, তখন সহসা একদিন কৃষ্ণকান্ত আসিয়া রণজিতের নিকট একটা প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। শঙ্করের সহিত চন্দ্রার বিবাহ দিবার নিমিত্ত তিনি রায় খুড়াকে ধরিয়া বসিলেন। রণজিৎ পূর্ব্ব হইতে এ প্রস্তাবে সম্মত ছিলেন, এক্ষণে আবার কৃষ্ণকান্তের অনুনয় শ্রবণে তাঁহার সরল হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি অকপট চিত্তে ইহাতে সম্মতি দান করিলেন। কথাটা ক্রমে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল; যে শুনিল, সে-ই আনন্দ প্রকাশ করিল। কেবল রূপনাথ আনন্দিত হইলেন না। তিনি ভাবিলেন, ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কৃষ্ণকান্তের একটা চক্রান্ত আছে।

কথাটা শঙ্করও শুনিলেন। তাঁহার ক্রোধ ও বিরক্তির

সীমা রহিল না। তিনি জ্যেষ্ঠতাতের সম্মুখে আসিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিলেন,—"আমি বিবাহ করিব না।"

রণজিৎ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র—তদ্গতপ্রাণ শঙ্কর লজ্জা সঙ্কোচশূন্য হইয়া তাঁহার সম্মুখে বলিতে সাহস করিল, "আমি বিবাহ করিব না।" তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন,—"কেন ?"

শঙ্কর বলিলেন,—"আমার ইচ্ছা।"

বৃদ্ধের হৃদয়ে একটা দারুণ আঘাত লাগিল। তথাপি তিনি বলিলেন,—"কিন্তু আমি যে বাক্য দিয়াছি ?"

শঙ্কর নীরস কণ্ঠে বলিলেন,—"সে জন্য আমি দায়ী নহি। আমি এ বিবাহ করিব না।"

শঙ্করের হৃদয়ে তখন ধু ধু করিয়া আগুন জ্বলিতেছিল, সে যন্ত্রণায় তিনি উন্মাদপ্রায় হইয়া কাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন, তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই কঠোর উত্তর শুনিয়া বৃদ্ধ স্তম্ভিত হইলেন। তিনি আর কোন কথা বলিলেন না। শঙ্কর দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। তখন চিরপরিচিত সংসারটা রণজিতের সম্মুখে উপহাসের একটা অট্টহাস্য হাসিয়া উঠিল, অভিমানের একটা তীব্র কষাঘাত আসিয়া তাঁহার মর্ম্মে প্রহত হইল। বৃদ্ধ বুঝিলেন, তিনি এখন সংসারপথের একজন শ্রান্ত পথিক, আর শঙ্কর

উন্নতশীর্ষ বিজয়ী যুবক। তাঁহার অবসন্ন হৃদয় মথিত করিয়া অভিমানের একটা দীর্ঘশ্বাস বহির্গত হইল।

পরদিন রায় মহাশয় শঙ্করকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন,—"শঙ্কর! আমার সংসারের নিকট বিদায় লইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু যাহা কখন দেখি নাই—দেখিবার আশাও করি নাই, তাহাই আজি দেখিলাম। এই শেষ বয়সে মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়াও যাহা দেখিলাম, তাহাতে আরও কিছুদিন বাঁচিতে সাধ হয়। কিন্তু সে সাধ বৃথা। আমার কালের ডাক পড়িয়াছে, এ সময়ে আমি তোমাদের নিকট ছুটি চাই।"

শঙ্কর জ্যেষ্ঠতাতের অভিমান বুঝিলেন। অনুতাপে—লজ্জায় তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি অশ্রু-প্লাবিত নয়নে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রণজিৎ তাঁহার মস্তকে সস্নেহে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন,—"কি করিব শঙ্কর! কাল কাহারও কথা শুনে না। নতুবা এমন সোণার রাজ্য ছাড়িয়া কি রণজিৎ যাইতে চাহিত? তুমি বালক হইলেও বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, কার্য্যক্ষম। তুমি চেষ্টা করিয়া নিজের হাতে যে রাজ্য গড়িয়াছ, নিজেই তাহার ভার গ্রহণ কর। আমাকে শেষ কয়দিন পথের সম্বল সংগ্রহ করিতে দাও।"

শঙ্কর কাঁদিতে কাঁদিতে জ্যেষ্ঠতাতের পাদমূলে বসিয়া পড়িলেন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—"তবে কি জন্য এত কষ্ট করিলাম? আমার সাধ্য কি, এ ভার একদিনের জন্যও বহন করি। এ সময়ে আপনি চলিয়া যাইলে এ রাজ্য যে একদিনও টিকিবে না?"

রণজিৎ, শঙ্করের হাত ধরিয়া তুলিলেন। বলিলেন,—"কেন শঙ্কর! তুমি তো এখন আর অক্ষম নও?"

শঙ্কর বলিলেন,—"সত্য, কিন্তু আমার সে ক্ষমতা কোথা হইতে আসিল? কাহার শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া আমার ক্ষুদ্রশক্তি এই দুর্লভ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইল? আমি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন, আপনাকেই আমার মাতা পিতা—আমার আরাধ্য দেবতা বলিয়া জানি; আপনারই স্নেহে—আপনারই করুণায় অনাথ শিশু আজি সংসারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে; আপনারই অমোঘ আশীর্ব্বাদে সে এই মহাশক্তি লাভ করিয়াছে। আপনি কি মনে করেন, আপনাকে হারাইয়া শঙ্কর একদিনের জন্যও সংসারে দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে? সব যাইবে—এতদিনে, এত চেষ্টায় তিল তিল করিয়া যে মহাসৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে, দেখিবেন, আপনার অভাবে তাহা একদিনেই ধূলিসাৎ হইবে; আপনার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের অস্তিত্ব লোপ পাইবে।"

অশ্রুপ্রবাহে শঙ্করের বক্ষ প্লাবিত হইল। রণজিৎ আর থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার অভিমান ক্রোধ কোথায় চলিয়া গেল, তাঁহারও নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি আবেগভরে শঙ্করকে বক্ষে চাপিয়া বলিলেন,—"না শঙ্কর! আমি যাইব না। তুমিই আমার সর্ব্বস্ব, দেশের সেবাই আমার তপস্যা, জন্মভূমিই আমার বৈকুণ্ঠ। এই বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর আমি—আর কোন্ ফলের আশায় কোন্ তীর্থে যাইব শঙ্কর?"

বৃদ্ধের অশ্রুধারায় শঙ্করের মস্তক সিক্ত হইতে লাগিল। শঙ্কর তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া সানন্দে প্রস্থান করিলেন। রণজিৎ মনে মনে বলিলেন,—"হায়, যদি আরএকবার অতীত জীবনটা ফিরিয়া পাইতাম?"

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—— •:*:• ——

বিবেক ও মোহ।

অনেকের এমন একটা সময় আসে, যখন বিবেক বলে, "যা হবার হয়েছে, আর কেন ফিরে চল।" মন বলে, "তাও কি হয়, যখন এতদূর আসা হয়েছে তখন শেষটাই দেখা যাক্।" বিবেক বলে, "কিন্তু শেষ দেখিতে এদিকে আর যে শেষ থাকে না?" মন বলে, "তাতে আর কি হবে, এখন ফিরলে লোকে হাসবে।" বিবেক বলে, "হাসে হাসুক, ক্ষতি কি, আপনার ভাল মন্দ তো দেখ্‌তে হবে?" মন বলে, "অত ভাল মন্দ দেখ্‌তে গেলে কোন ভাল কাজই হয় না।"

কৃষ্ণকান্তের এখন এই অবস্থা। তিনি এখন আর অগ্রসর হইবেন কি পশ্চাৎপদ হইবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। এক দিকে দেশের সুখশান্তিপূর্ণ উন্নতি, অন্য দিকে তাঁহার কুটিল স্বার্থ; এক দিকে সুখৈশ্বর্য্যময়ী আশার মধুর আহ্বান, অন্য দিকে ভীতির তীব্র কটাক্ষ। এই সঙ্কীর্ণ সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া তিনি কোন্ পথটা অবলম্বন

করিবেন, তাহা নিরূপণ করিতে পারিতেছেন না। বিবেক বলিতেছে, দেশের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে এ সময় তাঁহার মনোভাব প্রকাশ পাইলে আর রক্ষা নাই। তাঁহার হৃদয়ের গুপ্ত অভিসন্ধিটা যে অনেকের নিকট অপ্রকাশিত নাই, তাহা নিশ্চয়। তথাপি যে এখনও তাঁহার উপর কোনরূপ অত্যাচার হয় নাই, ইহাই পরম সৌভাগ্য। কিন্তু এইরূপে আর কয়দিন চলিবে? বিশেষতঃ দেশটা যখন এক প্রকার স্বাধীন হইয়াছে, তখন আবার তাহাকে মুসলমানের পদানত করা উচিত কি? মন বলিতেছে, অনুচিতই বা কিসে? দেশের স্বাধীনতায় তাঁহার লাভ কি? দেশ স্বাধীন, রণজিৎ রাজা হইয়াছে, রূপনাথ মন্ত্রীর পদে বসিয়াছে, শঙ্কর রাজ্য শাসন করিতেছে। আর তিনি? তিনি তো সেই একজন অধীন প্রজাই আছেন? তবে আর লাভটা কি? আর দেশটা কি চিরদিনই এইরূপ থাকিবে? মোগলেরা কি এই মুষ্টিমেয় সৈন্যের ভয়ে বাঙ্গালাটা ছাড়িয়া দিয়া পলাইবে? কখনই না। শীঘ্রই অসংখ্য মোগলসৈন্য আসিয়া আবার আপনাদের অধিকার স্থাপন করিবে। তখন—তখন তাঁহাকেও তো বিদ্রোহীর দলে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে? হায়, হায়, তবে কি হইবে? কৃষ্ণকান্ত এখন মারীচের অবস্থাটা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন। সম্মুখে ও পশ্চাতে বিপদের

ভীষণ ভ্রুকুটী দর্শনে তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আশাময় ভবিষ্যৎটা গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। তখনি কৃষ্ণকান্ত এই অন্ধকারময় দুর্গমপথে পার্ব্বতীর পরামর্শ-বর্ত্তিকার সাহায্য লওয়া যুক্তিযুক্ত জ্ঞান করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত আপনার অবস্থাটা পার্ব্বতীকে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন,—"পার্ব্বতি! এখন কি করা উচিত?"

পার্ব্বতী ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"তোমার মত কি?"

কৃষ্ণ। আমার মতে এখন কোন পক্ষেই যোগ দেওয়া উচিত নয়।

পা। তারপর?

কৃষ্ণ। তারপর যে দিকটা ভারি দেখিব, সেই দিকটা ধরিব।

পা। সে কখন্?

কৃষ্ণ। যখন দেখিব, হাজার হাজার মোগল সেনা আসিয়া দেশ ছারখার করিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখন ধীরে ধীরে গিয়া সেই দলে মিশিব।

পা। তখন তুমিও যে বিদ্রোহী নও, কেবল ভয়ে পড়িয়াই তাহাদের পক্ষে যোগ দিতেছ না, তাহা কিরূপে প্রমাণ করিবে?

কৃষ্ণ। প্রমাণ ফৌজদার।

পা। এখন ফৌজদারের কোন সাহায্য করিতেছ না, আর তখন সে তোমার হইয়া সাক্ষ্য দিবে কেন?

কৃষ্ণ। দিবে না?

পা। না। তখন কি হইবে জান?

কৃষ্ণ। কি হইবে?

পা। আগেই তোমার শূলের হুকুম হইবে।

কৃষ্ণকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"তবে উপায়? এখন মুসলমানপক্ষে যোগ আছে জানিতে পারিলে রণজিৎ রায় যে সর্ব্বনাশ করিবে?"

পা। সাধ্য কি? তবে তোমার মত নির্ব্বোধ পুরুষের কাছে সকলই সম্ভব বটে।

কৃষ্ণকান্ত ব্যগ্রদৃষ্টিতে পার্ব্বতীর জ্ঞানোজ্জ্বল মুখখানির দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"এখন আমাকে কি করিতে বল?"

পা। বোধ হয় শুনিয়াছ, রণজিৎ রায়ের দমনের জন্য সুবাদার পাঁচ হাজার সৈন্য পাঠাইয়াছে?

কৃষ্ণ। শুনিয়াছি, কিন্তু এখনও তো তাহারা আসিতে পারিল না?

পা। কেন আসিতে পারিতেছে না, জান কি?

কৃষ্ণ। শুনিতে পাই, তাহারা যেখানে যেখানে আসিয়া তাঁবু ফেলিতেছে, সেই খানেই হাজার হাজার গ্রামবাসী

মিলিয়া তাহাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিতেছে, তাঁবুতে আগুন ধরাইয়া দিতেছে, রসদ কাড়িয়া লইতেছে, কামান বন্দুক লইয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিতেছে। এই জন্যই তাহারা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

পা। এজন্য তাহারা সতর্ক হইলেই তো আর এরূপ ঘটে না? শুধু ইহাই নয়, আরও কারণ আছে।

কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত ভাবে বলিলেন,—"আর কি কারণ?"

পা। তাহারা রসদ পাইতেছে না। আগে দেশের লোকেই সে ভার লইত, কিন্তু এখন আর কেহ রসদ দেয় না। সিপাহীরা রসদের জন্য, গ্রাম লুট করে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই সকলে সতর্ক হয়। দেশে খাদ্য দ্রব্য যাহা কিছু থাকে, তাহা লোকে যতদূর পারে লুকাইয়া রাখে, অবশিষ্ট নদীতে ফেলিয়া দেয়। সিপাহীরা লুট করিয়া টাকা পায়, কিন্তু রসদ পায় না। দেশের্ লোক প্রাণ দেয়, তথাপি এক মুষ্টি রসদ দিতে চাহে না। কাজেই রসদ না পাইয়া সৈন্যেরা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

কৃষ্ণকান্ত একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুখ নত করিলেন। পার্ব্বতী বলিল,—"এখন তোমাকে তাহাদের রসদ যোগাইতে হইবে।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—"কি উপায়ে যোগাইব?"

পার্ব্বতী বলিল,—"উপায় অনেক আছে।"

তখন স্বামী স্ত্রী মিলিয়া অনেক পরামর্শ করিল। পার্ব্বতীর প্রতি কথায় কৃষ্ণকান্তের দুর্ব্বল হৃদয় সবল হইয়া উঠিতে লাগিল।

পরামর্শ শেষে কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—"কিন্তু রণজিৎ রায় যে সর্ব্বনাশ করিবে?"

পার্ব্বতী বলিল,—"তাহার উপায় আগেই করিতে হইবে। চন্দ্রার সহিত শঙ্করের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া আইস।"

কৃষ্ণকান্ত সবিস্ময়ে পার্ব্বতীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"সত্যই কি বিবাহ হইবে?"

তিরস্কারপূর্ণ তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পার্ব্বতী গম্ভীর কণ্ঠে বলিল,—"না।"

পার্ব্বতী সগর্ব্ব পদক্ষেপে চলিয়া গেল। কৃষ্ণকান্ত একা বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে ধ্বনিত হইতে লাগিল, "দেশের লোক প্রাণ দেয়, তথাপি এক মুষ্টি রসদ দেয় না।"

কৃষ্ণকান্ত যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "না— আমি নিমিত্ত হইব না।" তার পর কি ভাবিয়া তিনি উঠিলেন। চন্দ্রার সহিত শঙ্করের বিবাহ স্থির করিবার নিমিত্ত রণজিৎ রায়ের নিকট চলিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

——•:'*:(:○——

ঘটনাচক্র।

বিবাহের কথাটা ক্রমে অনেকেই শুনিল। চন্দ্রাও শুনিল, শুনিয়া সে প্রথমে বিস্মিতা পরে আনন্দিতা হইল। শঙ্কর তাহার আপনার হইবে, প্রাণের আরাধ্য দেবতাকে প্রাণ ভরিয়া পূজা করিতে পাইবে, ইহা হইতে সুখের সংবাদ আর কি আছে? আনন্দে চন্দ্রার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

একদিন রামরূপ চন্দ্রার কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল,—"চন্দ্রা!"

চন্দ্রা উত্তর করিল,—"কি?"

রামরূপ ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"আমার পুরস্কার কোথায়?"

চন্দ্রা লজ্জায় মুখ নত করিল। রামরূপ পূর্ব্বেই চন্দ্রাকে বুঝাইয়াছিল যে, এবারকার যুদ্ধে সে যদি না থাকিত, তাহা হইলে বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে নিশ্চয়ই শঙ্করকে প্রাণ দিতে

হইত। কিন্তু সে মোগলসৈন্য সাজিয়া, শঙ্করের পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু চন্দ্রা ইহাতেই বিশ্বাস করিয়াছিল।

চন্দ্রাকে নীরব দেখিয়া রামরূপ বলিল,—"সে দিনের কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ চন্দ্রা?"

চন্দ্রা মুখ তুলিয়া বলিল,—"এ জীবনে ভুলিব না।

রাম। তবে তোমার অঙ্গীকৃত পুরস্কার দাও?

চন্দ্রা। আমার দিবার কি আছে? বল তোমার কি চাই।

রাম। তোমার যাহা আছে, তাহাই চাই।

চন্দ্রা নীরবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তখন রামরূপ—লালসার দাস পাষণ্ড রামরূপ চন্দ্রার পদতলে জানু পাতিয়া বসিল। গদগদ কণ্ঠে বলিল,—"আমি তোমার করুণার ভিখারী চন্দ্রা! ভিখারীর প্রার্থনা পূর্ণ কর।"

চন্দ্রা কাঁপিয়া উঠিল, সভয়ে দুই পদ পিছাইয়া গেল, কোন উত্তর করিতে পারিল না। তখন রামরূপ কাতর স্বরে বলিল,—"চন্দ্রা! আমি তোমার রূপে মজিয়াছি; তোমার ঐ ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য আমার বুকে আগুন জ্বালাইয়াছে। এখন চন্দ্রা! আমাকে বাঁচাও।"

চন্দ্রার দেহ বায়ুবিতাড়িত বল্লরীবৎ কাঁপিতে লাগিল।

কম্পিত কণ্ঠে বলিল,—"তুমি এমন পাষণ্ড; তাহা আমি জানিতাম না। তুমি কি জান না, আমি আর একজনের বাগ্‌দত্তা পত্নী।"

রামরূপ সে বাগ্‌দানের মর্ম্ম বুঝিত। তথাপি বলিল,—"কিন্তু সে বাগ্‌দানে তুমি তো আবদ্ধা নও? তবে কেন আমাকে বিমুখ করিবে? আমি যে মরিতে বসিয়াছি চন্দ্রা?"

চন্দ্রা তীব্রকণ্ঠে বলিল,—"তোমার মরণই মঙ্গল। তুমি জান আমি কাহার ভাবী পত্নী?"

রামরূপ মনে মনে হাসিয়া বলিল,—"যাহারই হও, তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমি যে অনেকদিন হইতে তোমার মুখ চাহিয়া আছি?"

চন্দ্রা অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া বলিল,—"তুমি নরাধম।"

পৈশাচিক হাসি হাসিয়া রামরূপ বলিল,—"আমি তোমার দ্বারে প্রেমের অতিথি।"

চন্দ্রা মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। রামরূপ আর এক পদ অগ্রসর হইয়া বলিল,—"নিষ্ঠুর হইও না চন্দ্রা! আমার প্রাণ যায়, কেবল একবিন্দু—একবিন্দু প্রেমদানে আমাকে বাঁচাও—অঙ্গীকার পালন কর। নতুবা চন্দ্রা! তোমার সাক্ষাতেই আমি আত্মহত্যা করিব।"

রামরূপের নয়নে জল। সে দুই হাতে চন্দ্রার উভয়

পদ জড়াইয়া পায়ের উপর মাথা রাখিল। চন্দ্রা সবলে পা টানিয়া লইয়া তাহার মস্তকে পদাঘাত করিয়া বলিল,—"পাষণ্ড!"

রামরূপ উঠিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রার সে ভীমভৈরবী মূর্ত্তি দেখিয়া একটু ভীত হইল, তাহার উপেক্ষিত হৃদয় হতাশে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ক্রোধে ক্ষোভে তাহার হিতাহিত জ্ঞান তিরোহিত হইল। সে গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"তবে শোন চন্দ্রা! যাহা আশা করিয়াছ, তাহা কোনদিনই পূর্ণ হইবে না, শঙ্করকে তুমি কখনও পাইবে না। এ বিবাহের প্রস্তাব কেবল তোমার পিতার স্বার্থসিদ্ধির কৌশলমাত্র—কেবল শঙ্করের আর রণজিৎ রায়ের ছিন্ন মস্তকটা তাঁহার পায়ে লুটাইবার জন্য। তুমি আমারই হইবে; তখন এই অপমানের—এই পদাঘাতের কঠোর প্রতিশোধ লইব।"

চন্দ্রা কাঁপিয়া উঠিল, রামরূপ অস্থির পদে কক্ষ ত্যাগ করিল। কক্ষের বাহিরে গিয়া সে একবার ফিরিয়া দাঁড়াইল, তীব্র কণ্ঠে বলিল,—"আরও শুন, তুমি এখন শঙ্করের দৃষ্টিতে অবিশ্বাসিনী—পাপিষ্ঠা।"

রামরূপ চলিয়া গেল, চন্দ্রা শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"ঠাকুর! এ কি শুনিলাম?"

শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া চন্দ্রা অনেক কাঁদিল। কাঁদিতে

কাঁদিতে ভাবিল,সে এখন শঙ্করের দৃষ্টিতে অবিশ্বাসিনী! কেন এ অবিশ্বাস? তাহার অপরাধ কি? চন্দ্রা অনেক ভাবিয়াও কোন অপরাধের কারণ খুঁজিয়া পাইল না। তখন সে ভাবিল, রামরূপ মিথ্যাবাদী। কিন্তু সে এমন অসম্ভব মিথ্যাটা বলিবে কেন? তবে কি সে সত্যই শঙ্করের ভালবাসা হারাইয়াছে? চন্দ্রা ভাবিল, বুঝি হারাইয়াছে। ভাবিতেই তাহার হৃদয়টা ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। সে সবলে উপাধানে বুকটা চাপিয়া ধরিল। অনেকক্ষণ পরে চিত্তটা একটু স্থির হইল। তখন সে ভাবিল, ক্ষতি কি! আমি তো শঙ্করকে পাইবার আশায় ভালবাসি না, আমার এ ভালবাসায় তো প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা নাই? তবে দুঃখ কি? আমার এ ভালবাসার স্রোতে কে বাধা দিবে? চন্দ্রা একটু নিশ্চিন্ত হইল।

তার পর আর একটা ভয়ঙ্কর কথা তাহার মনে পড়িল। কেবল স্বার্থসিদ্ধির জন্য—কেবল শঙ্করের সর্ব্বনাশ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার পিতা এই বিবাহরূপ কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছে। মিথ্যাপ্রলোভনে মুগ্ধ রাখিয়া শত্রু বিনাশ করাই তাঁহার অভিপ্রায়। কি ভয়ঙ্কর কথা! কি ঘৃণিত কৌশল। কেবল চন্দ্রার মুখ চাহিয়াই শঙ্কর ও রণজিৎ তাঁহার গুপ্ত অভিসন্ধির দিকে লক্ষ্য করিবে না, তাঁহার কোন কার্য্যেই বাধা দিবে না, এই অবসরে পিতা আপন অভীষ্ট সিদ্ধ

করিবে। তবে কি চন্দ্রাই তাঁহাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইবে? সে কি কোন উপায়ই করিতে পারিবে না? জীবন দিয়াও কি শঙ্করকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না? চন্দ্রার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে শয্যাত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে গবাক্ষের নিকটে গিয়া বসিল।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। অপরাহ্নের সূর্য্য পশ্চিম গগনপ্রান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার শেষ কনকরশ্মি শঙ্খেশ্বরীর তরঙ্গে পড়িয়া নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া যাইতেছে। দিগন্তের শেষ প্রান্ত হইতে সন্ধ্যার ক্ষীণ রেখা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে; মন্দানিলে শঙ্খেশ্বরীর ঘাটের উপর সেফালিকার পাতাগুলি অল্পে অল্পে কাঁপিতেছে। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার শেষ সূর্য্যরশ্মি দিগন্তের কোলে মিশাইয়া গেল, ক্ষীণ ধূসর ছায়ায় ধরণী আচ্ছন্ন হইল। চন্দ্রা তখনও বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল,—'জীবন দিলেও কি শঙ্কর নিরাপদ হয় না?' সে একবার ভাবিল, কোন উপায়ে এই গুপ্ত অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া দিয়া শঙ্করকে সাবধান করিলে হয় না? পরক্ষণেই ভাবিল, তাহা হইলে পিতা বিপন্ন হইবেন। তবে এই মহাসন্ধিক্ষণে আপনাকেই বলি দিয়া সকল দিক্ রক্ষা করিলে হয় না? অন্ধকারাচ্ছন্ন সেফালিকা বৃক্ষের পত্রান্তরাল হইতে একটা পাখী চীৎকার

করিয়া বলিল,—"না না না।" কোন উপায় না দেখিয়া চন্দ্রা কেবল কাঁদিতে লাগিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে পার্ব্বতী কর্কশস্বরে ডাকিল,—"চন্দ্রা!"

চমকিত হইয়া চন্দ্রা ফিরিয়া চাহিল; পার্ব্বতীর রোষ-কম্পিত মূর্ত্তি দেখিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল। পার্ব্বতী বলিল,—"আজ তুই রামরূপকে লাথি মারিয়াছিস্?"

চন্দ্রা নতমুখে মৃদুস্বরে বলিল,—"হাঁ।"

পার্ব্বতী গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"কেন?"

চন্দ্রা তাহার কোন উত্তর দিতে পারিল না। লজ্জায় ঘৃণায় তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তখন পার্ব্বতী বলিল,—"বুঝিয়াছি, শঙ্করের সহিত বিবাহ হইবে শুনিয়া তোর বড় অহঙ্কার হইয়াছে। কিন্তু আমি তোর এ অহঙ্কার চূর্ণ করিব। শঙ্করের সহিত কিছুতেই তোর বিবাহ হইবে না।"

চন্দ্রা নীরবে বিমাতার রোষারক্ত বদনের দিকে চাহিয়া রহিল। পার্ব্বতী বলিল,—"আরও শোন, আজি তুই যাহাকে পদাঘাত করিয়াছিস্, তাহারই সহিত তোর বিবাহ হইবে। ইহাই তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত।"

পার্ব্বতী বেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইল। চন্দ্রা স্তম্ভিত হৃদয়ে বসিয়া শঙ্খেশ্বরীর নর্ত্তনশীল তরঙ্গের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার স্নিগ্ধ চন্দ্ররশ্মি আসিয়া

নদীতরঙ্গের উপর পড়িয়াছে। সেই জ্যোৎস্নাস্নাত তরঙ্গমালার দিকে চাহিয়া চাহিয়া চন্দ্রা ভাবিল,—'এইবার মরিতেই হইবে।'

পার্ব্বতী বলিলেও বাস্তবিকই রামরূপের সহিত চন্দ্রার বিবাহ অসম্ভব। কৃষ্ণকান্ত কখনই ইহাতে সম্মত হইবেন না। রামরূপ তাঁহাদের স্বজাতি নহে, বংশ-মর্য্যাদাতেও সমান নহে। যশোলিপ্সু কৃষ্ণকান্ত সমাজ বা লোকনিন্দার শাসন অগ্রাহ্য করিয়া কখনই এরূপ কার্য্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু ক্ষুদ্রবুদ্ধি চন্দ্রা এত কথা বুঝিল না। সে জানিত, বিমাতার যাহা ইচ্ছা, পিতা তাহার প্রতিরোধে অসমর্থ। তাই সে এবার যে পথটা সুগম দেখিল, তাহারই অনুসরণ করিল। তাহার যন্ত্রণাপীড়িত ব্যথিত হৃদয় শঙ্খেশ্বরীর জ্যোৎস্নাসমুজ্জ্বল নৃত্যশীল তরঙ্গের দিকে চাহিয়া হায় হায় করিয়া উঠিল; অমনই শঙ্খেশ্বরী যেন স্নেহপূর্ণ শত বাহু বিস্তার করিয়া তাহাকে 'আয় আয়' বলিয়া ডাকিল। সে স্নেহের আহ্বানে চন্দ্রা আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করিল, এইবার মরিতেই হইবে।

কৌমুদীপ্লাবিতা গভীরা রজনীতে শঙ্কর একা নদীতীরে সেফালিকা বৃক্ষচ্ছায়ায় দাঁড়াইয়াছিলেন। অনতিদূরে একটা বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া আবদুল স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে

চাহিয়াছিল। অল্পক্ষণ পরেই শঙ্কর সে স্থান ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আবদুলও তাঁহার অনুসরণ করিবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু আর এক ভীষণ দৃশ্য আবদুলের গতিরোধ করিল। সহসা নৈশগগন ভেদ করিয়া একটা ক্ষীণ আর্ত্তনাদ উঠিল। চমকিত হইয়া আবদুল চারিদিকে চাহিল। পরিষ্কার জ্যোৎস্নালোকে সে দেখিল, কৃষ্ণকান্তের বাটীর পার্শ্বস্থ উদ্যানের নিকট এক পুরুষ একটী স্ত্রীলোককে ধরিয়াছে। মুহূর্ত্ত পরেই পুরুষ সেই রমণীকে কক্ষে লইয়া যেখানে অন্ধকার বৃক্ষতলে আবদুল দাঁড়াইয়াছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইল। আবদুল চিনিল, সে পুরুষ রামরূপ। আবদুলের শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তস্রোত ছুটিল। তারপর রামরূপ, রমণীকে লইয়া যখন আবদুলের সমীপস্থ হইল, তখন আবদুল লম্ফ দিয়া তাহার সম্মুখে পড়িল; চীৎকার করিয়া বলিল,—"সয়তান!"

রামরূপ একবার আবদুলকে বেশ চিনিয়াছিল, আজি সে সহসা তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইল; মুহূর্ত্ত পরেই কক্ষস্থিত রমণীকে মাটীর উপর ফেলিয়া দিয়া সে ছুটিয়া পলাইল। আবদুল তাহার অনুসরণ অনাবশ্যক বোধ করিল। সে তখন ভূলুণ্ঠিতা রমণীর নিকটে আসিল। দেখিল, রমণী সংজ্ঞাহীনা। সে অঞ্জলি দ্বারা নদী হইতে

জল আনিয়া রমণীর মস্তকে ও মুখে দিল। কিন্তু তাহাতেও তাহার চৈতন্য হইল না। এদিকে শঙ্কর কোন্ দিকে গেলেন, তাঁহার কি হইল, তাহা আবদুল জানিতে পারিল না। সে ভাবিল, সে দিন রূপনাথের সর্ব্বনাশের নিমিত্ত সয়তান যেরূপ চক্রান্ত করিয়াছিল, আজিও হয়তো এই ঘটনার মধ্যে সেইরূপ একটা ভীষণ চক্রান্ত আছে। তখন শঙ্করের অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল। এদিকে মূর্চ্ছিতা রমণীকেও এরূপে ফেলিয়া যাওয়া যায় না। একটু ভাবিয়া শেষে আবদুল সেই সংজ্ঞাশূন্য রমণীদেহ স্কন্ধে তুলিয়া শঙ্করের অনুসরণে ছুটিল।

ঘটনার সূক্ষ্মচক্র আর এক দিকে ঘুরিয়া পড়িল। সে আবর্ত্তনে বিবেক ও মোহের দ্বন্দ্বযুদ্ধের অবসান হইল। জিতিল কে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—— •:):*:(:• ——

মোহ জিতিল।

আবদুল বাটীর নিকট আসিয়া শঙ্করের সাক্ষাৎ পাইল। শঙ্কর তাহার স্কন্ধে রমণীদেহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তখন আবদুল সমস্ত কথা তাঁহাকে বলিল। শঙ্কর তৎক্ষণাৎ সেই অচেতন রমণীদেহ বাটীর মধ্যে লইয়া গিয়া এক কক্ষে স্থাপন করিলেন, এবং তাহার শুশ্রূষার জন্য ব্যস্ত হইলেন। আবদুলের ডাকাডাকিতে কয়েকজন দাসদাসী উপস্থিত হইল। তাহাদের শুশ্রূষায় অল্পক্ষণ মধ্যেই রমণীর চৈতন্য হইল। এতক্ষণ শঙ্কর বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন, এক্ষণে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দাসদাসীরা প্রস্থান করিল। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই শঙ্কর বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। দেখিলেন সম্মুখে চন্দ্রা। তাঁহার সর্ব্বশরীরে বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছুটিল, তিনি একপদ পিছাইয়া দাঁড়াইলেন। তারপর ডাকিলেন,—

"চন্দ্রা!"

চন্দ্রা কোন উত্তর করিতে পারিল না। সে এখন

কোথায়, কি হইয়াছে, তাহাই প্রথমে বুঝিতে পারিল না। তারপর শঙ্করের কণ্ঠে এমন নীরস স্নেহহীন আহ্বান সে এই প্রথম শুনিল। ভয়ে বিস্ময়ে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া শঙ্কর আবার জিজ্ঞাসিলেন, —"চন্দ্রা! এত রাত্রিতে কোথায় যাইতেছিলে?"

এবার ধীরে ধীরে সকল কথা চন্দ্রার মনে পড়িল। মৃত্যুকামনায় গোপনে গৃহ হইতে নির্গমণ, তারপর রামরূপের আক্রমণ, তাহার প্রদত্ত বিষ আঘ্রাণে মূর্চ্ছা, এ সকল ঘটনাই তাহার মনে আসিল। কিন্তু তারপর কি হইয়াছে, কিরূপে সে এখানে আসিয়াছে, তাহা অনেক করিয়াও মনে করিতে পারিল না। দুইবারেও উত্তর না পাইয়া একটু রুক্ষস্বরে শঙ্কর বলিলেন,—"তুমি লজ্জায় বলিতে না পারিলেও আমি তাহা বুঝিয়াছি।"

চন্দ্রা উঠিয়া বসিল; ধীরে ধীরে বলিল,—"কি?"

শঙ্কর বলিলেন,—"তুমি অভিসারে বাহির হইয়াছিলে।"

অভিসার! চন্দ্রা কাঁপিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে বলিল, —"না।"

শঙ্কর। তবে রাত্রিকালে কোথায় যাইতেছিলে?

চন্দ্রা। মরিতে।

শঙ্কর। তবে মরিলে না কেন?

কি নিষ্ঠুর প্রশ্ন! শঙ্করের স্বরে উপহাসের তীব্রতা মিশ্রিত। চন্দ্রা বুঝিল, রামরূপের কথা সত্য। দুঃখে অভিমানে তাহার হৃদয়টা ফাটিয়া যাইতেছিল। সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল,—"এবার মরিব।"

শ। সত্য?

চ। সত্য।

শ। কেন মরিবে?

চ। জানি না।

শ। আমি জানি।

চ। কি জান?

শ। অনুতাপে। কিন্তু আজি আর মরিয়া কাজ নাই, এখন গৃহে যাও।

চ। আমি গৃহে যাইব না।

শ। কেন?

চ। বলিব না।

শ। উত্তম, আজি রাত্রিতে এইখানেই থাক, কালি যাহা হয় হইবে।

শঙ্কর প্রস্থানোদ্যত হইলেন। চন্দ্রা দ্রুতপদে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। তারপর কাতর দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"তুমি এমন হইলে কেন?"

"তাহা তুমিই বলিতে পার" বলিয়া শঙ্কর ক্ষিপ্রপদে প্রস্থান করিলেন। চন্দ্রা সেইখানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। তারপর একজন দাসী আসিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে যাইতে বলিল; চন্দ্রা উঠিয়া ধীরে ধীরে দাসীর পশ্চাৎ চলিল।

পরদিন প্রভাতে রণজিৎ রায় সমস্ত শুনিলেন। শুনিয়া ভাবিলেন, হয়তো বিমাতার সহিত বিবাদ করিয়া বালিকা অভিমানে আত্মহত্যা করিতে যাইতেছিল। কেবল বিধাতার কৃপায় সে এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে। তখন তিনি চন্দ্রার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে অনেক বুঝাইয়া বাটীতে যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু চন্দ্রা তাহাতে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। সে বৃদ্ধের পদদ্বয় ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমি আপনার বাটীতে দাসীবৃত্তি করিব, তথাপি গৃহে যাইব না। গৃহে যাইতে হইলেই আমি আত্ম-হত্যা করিব।"

বৃদ্ধ বুঝিলেন, অভিমানটা কিছু গুরুতর। তখন তিনি ভাবিলেন, দুই দিন এখানে থাকিলেই রাগটা পড়িয়া যাইবে। তখন বুঝাইয়া যাহা হয় করা যাইবে। ইহা ছাড়া বৃদ্ধের আর একটা গূঢ় অভিপ্রায় ছিল। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন, যে কোন কারণেই হউক চন্দ্রার উপর শঙ্করের একটু রাগ বা অভিমান হইয়াছে। এখন কিছুদিন একত্র থাকিলে সেই

রাগ বা অভিমানটা পড়িয়া যাইতে পারে। তখন চন্দ্রাকে আশ্বাস দিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেলেন। চন্দ্রা বুঝিয়াছিল, শঙ্কর নিশ্চয়ই কোনরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, অথবা তাঁহার মস্তিষ্ক কোন কারণে বিকৃত হইয়াছে। এ অবস্থায় শঙ্করকে ছাড়িয়া, অবিশ্বাসের গুরু ভার মস্তকে লইয়া চন্দ্রার মরিতে ইচ্ছা হইল না। শঙ্করের নিকট থাকিয়া, তাঁহার এই যন্ত্রণাময় ব্যাধির উপশমের চেষ্টা করাই সে আপনার কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিল।

এ দিকে চন্দ্রাকে দেখিতে না পাইয়া কৃষ্ণকান্তের বাটীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। তার পর কৃষ্ণকান্ত যখন শুনিলেন যে, রণজিৎ রায়ের বাটীতে চন্দ্রা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাঁহার মাথাটা যেন কাটা গেল। তিনি পার্ব্বতীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"তুমি আমার কুল, মান সমস্তই ডুবাইলে।"

পার্ব্বতী শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল,—"আমি ডুবাই নাই, তোমার গুণধরী কন্যাই ডুবাইয়াছে।"

কৃষ্ণকান্ত ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন,—"তোমার অত্যাচারেই সে এ কাজ করিয়াছে।"

পার্ব্বতী হাত নাড়িয়া বলিল,—"তোমার যেমন সূক্ষ্ম বুদ্ধি, তেমনই বুঝিয়াছ।"

কৃষ্ণ। তুমি চিরদিনই আমার বুদ্ধির দোষ দাও।

পা। দোষ দেখিলেই বলিতে হয়। নতুবা তুমি বলিবে কেন যে, আমিই চন্দ্রাকে তাড়াইয়াছি?

কৃষ্ণ। তবে কে তাড়াইল?

পা। কেহই তাড়ায় নাই, সে নিজে ইচ্ছা করিয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণ। ইচ্ছা করিয়া?

পা। হাঁ, ইচ্ছা করিয়া। জান নাকি সে শঙ্করকে কত ভালবাসে?

কৃষ্ণ। জানি, কিন্তু সেজন্য গৃহত্যাগ করিবে কেন?

পা। তাহাও কি তোমার বুদ্ধিতে আসে না? সে শঙ্করকে পাইবার আশায় গিয়াছে।

কৃষ্ণ। শঙ্করের সহিত তাহার বিবাহের কথা তো স্থির করিতেছিলাম?

পা। সে নিতান্ত ছেলে মানুষ নয়। তোমার সমস্ত কৌশলই সে বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই গোপনে গভীর রাত্রিতে শঙ্করের সহিত পলাইয়াছে।

কৃষ্ণ। শঙ্করের সহিত?

পা। হাঁ শঙ্করের সহিত। পূর্ব্বেই তাহাদের সমস্ত ষড়‍যন্ত্র ঠিক্ হইয়াছিল। তার পর কল্য শঙ্কর আসিয়া বাগানের

দ্বারে অপেক্ষা করিতেছিল, কালামুখী উঠিয়া গিয়া তাহার সহিত পলাইয়াছে।

কৃষ্ণ। তবে যাহা শুনিলাম, সে সমস্তই মিথ্যা ?

পা। সমস্তই মিথ্যা।

কৃষ্ণ। কিন্তু শঙ্কর এমন কাজ করিল ?

পা। কেন শঙ্কর এতই সাধু পুরুষ নাকি ?

কৃষ্ণ। প্রমাণ চাই।

পা। প্রমাণ দিতেছি।

তৎক্ষণাৎ রামরূপকে ডাকা হইল। রামরূপ আসিয়া বলিল,—"গত রাত্রিতে আমি অনিদ্রা বশতঃ উঠিয়া বাহিরে যাই। বাহিরে যাইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে পরিষ্কার জ্যোৎস্না-লোকে দেখিতে পাইলাম, বাগানের পাশে পথের উপর এক পুরুষ ও এক স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। স্ত্রীলোকের সর্ব্বাঙ্গ কাপড়ে ঢাকা, সুতরাং তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। কিন্তু সে পুরুষ যে শঙ্কর, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। তখন ব্যাপারটা জানিতে আমার কৌতূহল হইল, আমি দ্রুত পদে সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু বাড়ীটা ঘুরিয়া যাইতে আমার একটু বিলম্ব হইল, সেই অবসরে, বোধ হয় আমাকে দেখিতে পাইয়া তাহারা আমার উপস্থিতির পূর্ব্বেই প্রস্থান করিয়াছিল। আমি সেখানে গিয়া কাহাকেও দেখিতে পাই-

লাম না। তখন মনে হইল, বোধ হয় আমার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছে। তাই কথাটা লইয়া রাত্রিতে আর কোন গোলমাল করি নাই।"

রামরূপ এক নিশ্বাসে এত বড় কল্পিত মিথ্যাটা বলিয়া ফেলিল। কৃষ্ণকান্ত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলি-লেন,—"ঈশ্বর সাক্ষী, যে নরাধম আমার কুলমানের মস্তকে এরূপে পদাঘাত করিয়াছে, তাহার শোণিতাক্ত মস্তক মুসলমানের পদতলে লুটাইবে। কিন্তু হায়, শঙ্কর এমন?"

পার্ব্বতী বলিল,—"কেবল ইহাই নয়।"

কৃষ্ণকান্ত সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। পার্ব্বতী বলিল,—"শঙ্কর ঘোর পাষণ্ড। এতদিন লজ্জায় ঘৃণায় যাহা বলি নাই, আজি তাহা বলিব। তবে শুন, শঙ্কর আমার উপরেও——"

পার্ব্বতীর নেত্রপ্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। কৃষ্ণকান্ত গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"যথেষ্ট হইয়াছে। বুঝিয়াছি, বাঙ্গালার পতন অনিবার্য্য—বাঙ্গালীর অদৃষ্ট ঘোর তমসাচ্ছন্ন।"

ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে কৃষ্ণকান্ত বাহিরে গেলেন। তখন পার্ব্বতী রামরূপের উপর একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সহাস্যে বলিল,—"কেমন?"

রামরূপও হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আমিও কেমন ?"

পা। তুমি তো আমার হাতের পাধা পেটা ঘোড়া।

রাম। স্বীকার করিলাম।

তখন পার্ব্বতী মুখখানা একটু গম্ভীর করিয়া বলিল,—"বল দেখি রূপ! ইহার পরিণাম কি হইবে ?"

রাম। শঙ্করের পতন।

পা। আর ?

রাম। আর কৃষ্ণকান্তের কৃষ্ণপ্রাপ্তি।

পা। তারপর ?

রাম। তারপর তুমি রাণী।

পা। আর তুমি ?

রাম। আমি রাজা হইব।

একটা বিদ্যুন্ময় কটাক্ষ সন্ধান করিয়া পার্ব্বতী বলিল,—"তুমি আমার গোলাম হইবে।"

রামরূপ হাসিতে হাসিতে বলিল,—"এখনও যা, তখনও তাই ? আমার কি আর পদোন্নতি হইবে না ?"

পার্ব্বতী হাসিয়া বলিল,—"তোমার আশার শেষ নাই।"

রামরূপ বলিল,—"এমন অসীম সুধার সমুদ্র সম্মুখে থাকিতে কাহার আশার শেষ হয় ?"

পা। আমি কি এতই সুন্দর ?

রাম। তুমি সুন্দরের অপেক্ষাও সুন্দর।

পার্ব্বতী হাসিয়া রামরূপের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। হাসিতে হাসিতে বলিল,—"সত্যই রূপ! তোমাকেই এ রাজ্যের—এ হৃদয়ের রাজা করিব।" মনে মনে বলিল,—"তোমাকেই আগে জাহান্নমে পাঠাইব।"

রামরূপ সেই প্রেমবিহ্বলা সুন্দরীকে উভয় বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া মনে মনে ভাবিল,—"বুকের উপর যে রাজ্য, ইহার অধিক রাজ্য কোথায়?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—(১)—

ভালবাসা ও সন্দেহ।

চন্দ্রা যাহা ভাবিয়াছিল, তাহা হইল না; সে আসিয়া অবধি আর শঙ্করের সাক্ষাৎ পাইল না। শঙ্কর এখন আর বাটীর মধ্যে প্রায় আসেন না, বহির্ব্বাটীতেই থাকেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন,"কাজ অনেক যাইবার অবসর নাই।"

কাজ যে অনেক, ইহা যথার্থ। রস্তমআলি দামোদর নদ পার হইয়া পলায়ন করিলেও ভবিষ্যৎ আক্রমণের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। এবার যে রস্তমআলি সুবাদারের সাহায্য লইয়া প্রচণ্ড পরাক্রমে আর এক বার আক্রমণ করিবে, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ ছিল না। সুতরাং ভাবী আক্রমণা-শঙ্কায় রণজিৎকে যুদ্ধের জন্য বিপুল আয়োজন সহকারে প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। শঙ্করই সে বিষয়ের প্রধান উদ্যোগী; অতএব তাঁহাকে প্রায় সর্ব্বদাই বিবিধ কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাঁহার অন্তঃপুরে একবার আগমনের অবসর ছিল না তাহা নহে। ফল কথা,

শঙ্কর ইচ্ছা করিয়াই আসিতেন না। না আসিবার বিশেষ কারণও ছিল।

যে যতই সন্দেহ বা অবিশ্বাসের দৃঢ় বন্ধনে বেষ্টিত হউক, ভালবাসার প্রাণহীন কঠোর প্রতিদানের আঘাতে যাহার হৃদয় যতই জর্জ্জরিত হউক, যে একবার ভালবাসিয়াছে—মুখের ভালবাসা নয়, হৃদয় ঢালিয়া ভালবাসিয়াছে, আপনার সর্ব্বস্ব পরের চরণে উৎসর্গ করিয়া ভিখারী হইয়াছে, সে সন্দেহের শত আঘাতে—প্রাণহীন প্রতিদানের সহস্র ভ্রূকুটি সত্ত্বেও ভালবাসা ভুলিতে পারে না। যাহা একবার বিলাইয়া দিয়াছে, তাহা আর ফিরাইয়া লইতে চাহে না। সেই গভীর অতলস্পর্শী ভালবাসায় যখন সন্দেহ আসিবে, যখন তীব্র প্রতিদানের নির্ম্মম ছুরিকা উন্মুক্ত জীবনের উপর উত্থিত হইবে, তখন সে সেই ছুরিকার আঘাতে আত্মহৃদয় সহস্র খণ্ডে বিচ্ছিন্ন করিবে, আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া ভালবাসার মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিবার জন্য প্রস্তুত হইবে; কিন্তু যাহাকে ভালবাসে, তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিবে না, তাহার হৃদয়ে এতটুকুও আঘাত করিতে সাহসী হইবে না। যে হইবে, সে ভালবাসে না, সে কেবল লালসার দাস। ভালবাসায় আত্মবিসর্জ্জন—লালসায় উপভোগ।

শঙ্কর, চন্দ্রাকে ভালবাসিয়াছিলেন। সে ভালবাসা ভুলি-

বার নয়, শত আঘাতেও তাহা স্থিতিশীল। সেই অতলস্পর্শী ভালবাসায় যখন সন্দেহের প্রলয় তরঙ্গ উত্থিত হইল, তখন শঙ্কর সেই ভীম তরঙ্গে আপনাকে বিসর্জ্জন দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু চন্দ্রাকে কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। এই ভীষণ তরঙ্গের প্রথম আঘাতটা যখন তাঁহার হৃদয়ে প্রচণ্ড ভাবে আহত হইল, তখন সে আঘাতে হৃদয়টা এক বার উদ্বেলিত—একবার বিকৃত হইয়া উঠিল। কিন্তু ভাল-বাসার স্বভাবসিদ্ধ গুণে আবার তাহা ক্রমে স্থির—গম্ভীর হইল। তখন আর শত আঘাতেও তাহা বিচলিত হইবার নহে।

কিন্তু সেই প্রথম আলোড়ন কালে—সেই ভয়ঙ্কর সময়ে যখন চন্দ্রা তাঁহার সম্মুখে পড়িল, তখন তিনি বিকৃত হৃদয় লইয়া চন্দ্রার হৃদয়ে একটু আঘাত করিলেন। কিন্তু সেই একটু আঘাত তাঁহার হৃদয়ে শত গুণ প্রতিঘাত করিল। তখন আর তাঁহার লজ্জা, অনুতাপ ও ভয়ের সীমা থাকিল না। শঙ্কর ভাবিলেন, ছিঃ ছিঃ করিলাম কি? আত্মসুখে বাধা পাইয়া চন্দ্রার হৃদয়ে এমন কঠোর আঘাত করিলাম? এই আঘাতের যন্ত্রণায়—এই অভিমানে চন্দ্রা যদি আত্মহত্যা করে? ছিঃ ছিঃ কি করিলাম? আমি চন্দ্রার নিকট যাইয়া তাহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিব। আমি তাহাকে ভালবাসি,

সে আমার ইচ্ছা; তাহাতে চন্দ্রার কি? সে যদি অন্তকে ভাল-বাসিতে ইচ্ছা করে, ভালবাসিয়া যদি সে সুখ পায়, তবে আমি তাহার সে সুখে বাধা দিবার কে? আমি তাহাকে ভালবাসিতে পারি, কিন্তু তাহার ভালবাসার দাবী করিতে আমার অধিকার কোথায়? আমি চন্দ্রার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিব।

কিন্তু ক্ষমা চাহিতে যাইতে শঙ্করের সাহস হইল না। ভাবিলেন, 'তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া হৃদয়ের আবেগে আবার যদি তাহার হৃদয়ে ব্যথা দিই? এ হৃদয়কে বিশ্বাস নাই। এ হৃদয় ক্ষমার অযোগ্য। আমি আর তাহার সম্মুখে যাইতে পারিব না।'

কয়দিন হইতেই শঙ্করের হৃদয়ে এইরূপ তুমুল ঝড় বহিতে-ছিল। ক্ষোভে অনুতাপে তাঁহার বুকটা ফাটিয়া যাইতে-ছিল। তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতে-ছিলেন না। কিছুতেই হৃদয় স্থির করিতে না পারিয়া তিনি রূপনাথের নিকট ছুটিলেন।

রূপনাথ তখন সেতারের ঝঙ্কারের সহিত আপনার গলা মিশাইয়া মধুর কণ্ঠে গাহিতেছিলেন,—

শ্যামা নয় সামান্যা রে মন, গাছের ফল কি পেড়ে খাবি?
বিবেক-কুলুপে আগে অভিমানের দ্বারে লাগাও চাবি।

শ্যামামায়ের প্রেমসাগরে, ডুবিয়ে দাও মন বাসনারে,
(সেথা) আপনার রতন খুঁজ্‌লে পরে শুধুই মরবি
খেয়ে খাবি।
আগুন জ্বালাও সুখের মুখে, দুঃখের অনল জ্বাল বুকে,
আমার আমার যাবে চুকে, তবে শ্যামা মাকে পাবি॥

শঙ্কর বিহ্বল হৃদয়ে দাঁড়াইয়া এই মধুর সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন। তারপর গীত থামিলে ধীরে ধীরে রূপনাথের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রূপনাথ তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। শঙ্কর উপবেশন করিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর! অভিমান থাকিলে কি পাওয়া যায় না?"

রূপনাথ বলিলেন,—"না শঙ্কর! প্রেমে অভিমান নাই।"

শ। তবে আছে কি?

রূ। আছে অনন্ত সুখ, অনন্ত শান্তি।

শ। আর দুঃখ?

রূ। প্রেমে দুঃখ নাই, প্রেম অভ্যাসে দুঃখ আছে।

শ। অভ্যাসে দুঃখ কেন?

রূ। অভ্যাস কালে বাসনা থাকে।

শ। তারপর?

রূ। তারপর যখন বাসনার শেষ হইবে, তখনই দুঃখেরও অবসান হইবে। তখন কেবল সুখ, কেবল শান্তি।

শঙ্কর একটু ভাবিয়া বলিলেন,—"কিন্তু ইহা ঈশ্বর প্রেমের কথা; মানুষের প্রতি যে প্রেম?"

রূপনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"প্রেম একই, তাহাতে মানুষ ঈশ্বর ভেদ নাই। প্রেমের দৃষ্টিতে মানুষ ঈশ্বর এক। আর যে সসীম ক্ষুদ্র মানবকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে, তাহার অসীম অনন্ত-সৌন্দর্য্যময় ঈশ্বরকে ভালবাসিতে কতক্ষণ?"

শ। ঈশ্বরকে ভালবাসিতে গেলেও কি দুঃখ পাইতে হয়?

রূ। অভ্যাস কালে দুঃখ আছে বৈকি।

শ। অসম্ভব; ঈশ্বরের ভালবাসায় সন্দেহ নাই।

শঙ্কর নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। রূপনাথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ডাকিলেন,—"শঙ্কর!"

শঙ্কর উত্তর করিলেন,—"কি?"

"কাহাকেও ভালবাসিয়াছ?"

"বাসিয়াছি।"

"তাহাকে পাইবার আশা আছে?"

"আগে ছিল।"

"এখন?"

"এখন নাই।"

"কেন?"

"তাহা বলিতে পারিব না।"

রূপনাথ সহাস্যে বলিলেন,—"তুমি না বলিলেও আমি তাহা বুঝিয়াছি।"

শঙ্কর সবিস্ময়ে বলিলেন,—"কি বুঝিয়াছেন?"

রূ। তুমি যাহাকে ভালবাস, সে তোমাকে ভালবাসে না, অথবা তাহার ভালবাসায় তোমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

শ। আপনি জ্যোতিষী।

রূ। ঠিক্ তাহা নহি। আর এই সামান্য বিষয়টা বুঝিবার জন্য জ্যোতিষের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু শঙ্কর আমার একটা কথা শুনিবে?

শ। আপনার কোন্ কথা না শুনি?

রূ। উত্তম; যাহাকে ভালবাস, তাহার ভালবাসায় সন্দেহ করিও না।

শ। আমি নিজে দেখিয়াছি।

রূ। ভালবাসার প্রাবল্যে তোমার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটা অসম্ভব নহে।

শ। নিজের কর্ণে সে কথা শুনিয়াছি।

রূ। শুনিলেও কথার কোন এক অংশ শুনিয়াছ। হয়তো প্রথমটা শুন নাই, কিম্বা প্রথমাংশ শুনিয়া ধৈর্য্য সহকারে শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে অপেক্ষা কর নাই। কেমন ইহা সত্য কি?

শ। আপনি সর্ব্বজ্ঞ।

রূ। হইতে পারি। কিন্তু এখন বুঝিয়া দেখ, তোমার এ সন্দেহ মিথ্যা কি না।

শঙ্কর নীরবে রহিলেন। রূপনাথ বলিলেন,—"আর এক কথা, তুমি যাহাকে ভালবাস বলিয়া মনে কর, তাহাকে তুমি যথার্থ ভালবাস নাই।"

শঙ্কর গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"মিথ্যা কথা।"

রূপ। মিথ্যা নহে, অতি কঠোর সত্য। যে ভালবাসায় ক্ষণে ক্ষণে সন্দেহ—ক্ষণে ক্ষণে বিরাগের আবির্ভাব হয়, তাহা ভালবাসা নামের অযোগ্য, সে ভালবাসা লালসার নামান্তর। যাহাকে ভালবাসিব, তাহার আবার দোষ কোথায়? তাহার সব সুন্দর, সকলই নির্দ্দোষ, সমস্তই গুণ। যতক্ষণ তাহার এতটুকুও দোষ দেখিতে পাইবে, ততক্ষণ ভালবাসার গর্ব্ব করিও না।

শঙ্কর বিস্মিত, স্থির, নির্ব্বাক্। রূপনাথ বলিতে লাগিলেন,—"এই গর্ব্ব, এই লালসা, এই সন্দেহ ত্যাগ করিয়া

যথার্থ ভালবাসিতে অভ্যাস কর। যে ভালবাসায় অভিমান নাই আনন্দ আছে, ভোগ নাই ত্যাগ আছে, তাহাই প্রকৃত ভালবাসা। সে ভালবাসার পরিণাম বড় সুন্দর, বড় মধুর, বড় শান্তিময়। কিন্তু তাহার মধ্যে সন্দেহকে স্থান দিও না। যাহাকে ভালবাস, আপনার হৃদয় দিয়া তাহার হৃদয় দর্শন কর, তাহার সুখদুঃখে আপনাকে সুখী দুঃখী জ্ঞান কর; তবে ভালবাসা সম্পূর্ণ হইবে। ভালবাসার শান্তিময় কুটীরে দুঃখের অনল জ্বালাইও না শঙ্কর!"

শঙ্কর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"প্রত্যক্ষ দেখিলেও বিশ্বাস করিব না?"

রূ। কাহাকে বিশ্বাস? চক্ষুকে অথবা কর্ণকে বিশ্বাস করিও না। আপনার হৃদয় দিয়া ভালবাসার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবে।

এমন সময় বাহির হইতে আবদুল ডাকিল,—"ঠাকুর!"

রূপনাথ ও শঙ্কর উভয়ে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

——০:)::(:০——
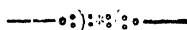
বাঙ্গালীর ব্রতপালন।

রূপনাথ ও শঙ্কর বাহিরে আসিলে আবদুল তাঁহাদিগকে সেলাম করিয়া বলিল,—"রস্তম আলি ছয় হাজার সৈন্য লইয়া দামোদর পার হইয়াছে।"

রূপনাথ বলিলেন,—"কতদূর অগ্রসর হইয়াছে ?"

আব। দশ বারো ক্রোশ।

শঙ্কর সবিস্ময়ে বলিলেন,—"এতদূর! কেহ বাধা দিতেছে না ?"

আব। না।

রূপ। তাহারা রসদ পাইতেছে কোথায় ?

আব। তাহা কেহ ঠিক বলিতে পারে না। তবে শুনিতেছি, তাহারা যে পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহার স্থানে স্থানে কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী চাল ধানের বড় বড় কারবার খুলিয়াছে।

রূপ। সেখানকার লোকেরা কি বলিতেছে ?

আব। তাহারা বলে, আমরা আর কতদিন এরূপে ধনপ্রাণ নষ্ট করিয়া শত্রুসৈন্যের গতিরোধ করিব।

রূপ। আরও পূর্ব্বে সংবাদ লওয়া উচিত ছিল।

আব। দুই তিন দিনের মধ্যেই এতদূর হইয়াছে।

রস্তমআলি তৃতীয় বার যুদ্ধে পরাজিত ও পশ্চাত্তাড়িত হইয়া দামোদর পার হইতে বাধ্য হইলেন। তখন তিনি বুঝিলেন, এ বিদ্রোহ সামান্য নয়। ভাবিলেন, এই সময়ে এ সংবাদ সুবাদারের কর্ণগোচর করা আবশ্যক; কে জানে, কালে এই বিদ্রোহ কিরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিবে। তখন হয়তো এজন্য তাঁহাকেই দায়ী হইতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া রস্তমআলি সংবাদ জ্ঞাপনার্থ সুবাদারের নিকট এক বিশ্বস্ত দূত প্রেরণ করিলেন; এবং আত্মদোষ ক্ষালনার্থ বিদ্রোহের প্রকৃত তথ্য গোপন করিয়া এক কল্পিত বিকৃত সংবাদ লিপিবদ্ধ করতঃ তাহা সুবাদার সমীপে গোচর করিলেন। সে সংবাদ শুনিয়া সুবাদার ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, তারপর এক জন বিচক্ষণ সেনাপতির নেতৃত্বে চারি হাজার সৈন্য বিদ্রোহ-দমনার্থ পাঠাইয়া দিলেন।

সুবাদার-প্রেরিত চারি হাজার সৈন্য আসিয়া রস্তমআলির দুই সহস্র সৈন্যের সহিত মিলিত হইল। তখন তিনি সেই ছয় সহস্র সৈন্য লইয়া মহোৎসাহে আবার দামোদর পার

হইলেন। কিন্তু দামোদর পার হইলেও তাঁহার অগ্রসর হইবার পথে ভীষণ বাধা সমূহ উপস্থিত হইতে লাগিল। রূপনাথের উপদেশানুসারে চতুর্দ্দিকের অধিবাসিগণ সমবেত হইয়া অতর্কিত ভাবে মোগল শিবির আক্রমণ করিতে লাগিল, এবং নানারূপে সৈন্যগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অধিকন্তু কেহই সৈন্যদিগকে রসদ যোগাইল না। এই সকল অসুবিধায় রস্তম আলি সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তিনি দামোদর তীরে শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক এই সকল অসুবিধা নিবারণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুইমাস কাটিয়া গেল।

ইহার পর সৈন্যগণের নিকট যে রসদ ছিল, অথবা তাহারা গ্রাম লুট করিয়া যে যৎকিঞ্চিৎ রসদ সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা ফুরাইয়া আসিল। তখন রসদের অভাবে সৈন্যগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল, তাহারা রাজধানীতে প্রত্যাগমনের জন্য ব্যস্ত হইল। রস্তমআলি অতিশয় চিন্তিত হইলেন। অনেক চিন্তার পর তিনি কৃষ্ণকান্তের নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত প্রথমে রসদ যোগাইতে স্বীকৃত হইলেন না। রস্তম আলি প্রমাদ গণিলেন। তিনি বারবার বিবিধ প্রলোভন প্রদর্শন পূর্ব্বক কৃষ্ণকান্তকে রসদ যোগাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণকান্ত যে বিবেকটুকু লইয়া বারবার ফৌজদার সাহেবের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতেছিলেন, ঠিক এই সময়ে পার্ব্বতীর চক্রান্তে অথবা ঘটনা বশে তাঁহার সে বিবেকটুকু অন্তর্হিত হইয়া গেল। প্রতিশোধের নিদারুণ বহ্নি হৃদয়ে জ্বালাইয়া তিনি দেশের সর্ব্বনাশে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। তখন তিনি ফৌজদার সাহেবকে অভয় দিয়া সৈন্যগণের রসদ সরবরাহ করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। সঙ্কল্প মাত্রেই স্থানে স্থানে তাঁহার বৃহৎ বৃহৎ কারবার প্রতিষ্ঠিত হইল, ব্যবসায়চ্ছলে তিনি গোপনে মোগলসৈন্যের আহার যোগাইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষিত উত্তেজিত গ্রামবাসিগণকে বিবিধ বাক্যে বুঝাইয়া, অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া, ভয় দেখাইয়া মোগল-বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে নিবারণ করিলেন। তখন রস্তমআলি নির্ব্বিঘ্নে সৈন্যসহ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দেশের লোকেই রূপনাথের নিকট শত্রুসৈন্যের গতিবিধির সংবাদ জানাইত, কিন্তু তাহারা কৃষ্ণকান্তের প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া কেহই এ সংবাদ রূপনাথকে জানাইল না; সুতরাং রূপনাথ এ সংবাদ পাইবার পূর্ব্বেই শত্রুসৈন্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িল। তিনি যখন সংবাদ পাইলেন, তখন শত্রুগণ দেবীগড়া হইতে ছয় ক্রোশ মাত্র দূরে

শিবির সংস্থাপন করিয়াছে। আবদুলের মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রূপনাথ ভাবিলেন, এইবার শেষ। তাঁহার হৃদয় মথিত করিয়া একটা তপ্ত শ্বাস বহির্গত হইল।

পরদিন অপরাহ্ন কালে ছয় সহস্র মোগলসৈন্য আসিয়া দেবীগড়ার এক ক্রোশ দূরে শিবির সন্নিবেশ করিল। তাহা দেখিয়া রণজিৎ রায় একটু চিন্তিত হইলেন। তিনি রূপনাথকে ডাকাইয়া ইহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। রূপনাথ বলিলেন,—"এ যুদ্ধে জয়ের কোনই সম্ভাবনা নাই। অতএব যদি আত্মরক্ষা ও সম্পত্তি রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে সন্ধিসংস্থাপনের চেষ্টা করুন।"

রণজিৎ বলিলেন,—"কিন্তু গর্ব্বিত ফৌজদার কি সন্ধিতে সম্মত হইবে?"

রূপনাথ বলিলেন,—"না হওয়াই সম্ভব। তবে সেনাপতি ও ফৌজদারকে গোপনে কিছু অর্থ দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে বোধ হয় সন্ধি হইতে পারে।"

রণজিৎ বলিলেন,—"সন্ধির প্রার্থনা করা হউক, কিন্তু গোপনে উৎকোচ দান করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিব না।"

তখন সন্ধিপ্রার্থনার জন্য এক দূত মোগল শিবিরে প্রেরিত হইল। রস্তমআলি তাহাকে বলিয়া দিলেন,—"কুড়ি

হাজার টাকার সহিত রূপনাথ ও কমলাকে অর্পণ করিলে সন্ধি স্থাপিত হইতে পারে।"

রণজিৎ পুনর্ব্বার দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি রূপনাথ ও কমলার পরিবর্ত্তে আরও দশ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত আছেন। কিন্তু রস্তমআলি এ প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন না। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, রূপনাথ ও কমলাকে হস্তগত করিয়া এ অপমানের প্রতিশোধ লইতে হইবে। সন্ধির প্রস্তাবে সেনাপতি কতকটা সম্মত হইলেও রস্তম আলি তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, এই বুড়া জমিদারটা বড়ই বেইমান; সৈন্যেরা প্রত্যাগমন করিলেই আবার বিদ্রোহ বাধাইবে। সেনাপতি বলিলেন,—"তবে বেইমানকে জাহান্নমে দাও।"

সন্ধ্যার পর রণজিৎ পুনর্ব্বার রূপনাথকে ডাকাইয়া সমস্ত বলিলেন। শুনিয়া রূপনাথ বলিলেন,—"এত সহজে যদি সন্ধি হয়, তবে তাহাতে আপত্তি কি?"

রণজিৎ চক্ষু বিস্তৃত করিয়া বলিলেন,—"তুমি ফৌজদারের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে?"

রূপনাথ সহাস্যে বলিলেন,—"ক্ষতি কি? আপনি আমার জন্য এতদূর করিলেন, আর আমি আপনার জন্য এই তুচ্ছ কাজটা করিতে পারিব না?"

সবিস্ময়ে রণজিৎ বলিলেন,—"কমলাও যাইবে?"

রূপনাথ স্থিরকণ্ঠে বলিলেন,—"যাইবে।"

রণজিৎ স্তম্ভিতের ন্যায় ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তারপর ?"

রূপনাথ বলিলেন,—"সে জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই।"

রণজিৎ কপোলে করসংলগ্ন করিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। তারপর বলিলেন,—"আমাদের কত সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে ?"

রূ। অস্ত্রধারী সৈন্য দেড় সহস্রাধিক।

র। আর পাইক সৈন্য ?

রূ। আটশত।

র। আরও কিছু সংগৃহীত হইতে পারে ?

রূ। আরও আটশত পাইক সৈন্য সংগ্রহ হইয়াছে। কিন্তু তাহারা একদিন পরে এখানে পৌছিতে পারে।

র। আপাততঃ এই সৈন্য দ্বারা একদিন যুদ্ধ চলিতে পারে না কি ?

রূ। একদিন অনায়াসেই চলিবে।

র। আর যদি একদিন যুদ্ধ স্থগিত থাকে, তাহা হইলে বোধ হয় সংগৃহীত সৈন্যেরাও উপস্থিত হইবে ?

রূ। নিশ্চয়ই।

র। উত্তম, আমি একদিনের জন্য সময় প্রার্থনা করিব।

রূ। তাহারা সময় দিবে না।

র। চেষ্টা করিব। অবশেষে উপস্থিত সৈন্য লইয়াই একদিন যুদ্ধ চলিবে।

রূ। তবে কি সন্ধি হইবে না?

র। না।

রূ। কিন্তু——

রণজিৎ দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"ইহার আর কিন্তু নাই। ব্রাহ্মণ! রণজিৎরায় প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু সত্যভঙ্গ করিতে পারে না। ঠাকুর! সেদিনকার কথা মনে পড়ে? সেদিন তুমিই তো এ বৃদ্ধের অবসন্ন হৃদয়কে উত্তেজিত করিয়াছিলে? এই বৃদ্ধ বাঙ্গালী জমিদারের জীর্ণ হৃদয়ে উৎসাহের তীব্র মদিরা ঢালিয়া তাহাকে রণমদে মাতাইয়াছিলে? তোমার মোহন মন্ত্রে বশীভূত হইয়াই তো ভীরু দুর্ব্বল বাঙ্গালী এই মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছিল? তবে আজি আবার এ ভগ্ন হৃদয়কে আরও ভাঙ্গিয়া দাও কেন ঠাকুর? যাও আপনার কার্য্য দেখ; এ যুদ্ধে বৃদ্ধ স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিবে।"

রূপনাথ কাঁদিয়া ফেলিলেন; বলিলেন,—"আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই।"

রণজিৎ বলিলেন,—"চিনিবার মত আমার কিছুই নাই। তবে আমার অস্ত্রধারণের গুহ্যরহস্য শুন ঠাকুর। আমাদের বংশে একটা প্রবাদ আছে, যে দিন এ বংশের কোন প্রবীণ ব্যক্তি ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিবে, সে দিন বিশালাক্ষী দেবী স্বয়ং খড়্গহস্তে রণস্থলে আবির্ভূতা হইবেন। আমি এবার সেই প্রবাদের পরীক্ষা করিব। যাও ঠাকুর, এযুদ্ধে মা স্বয়ং আসিবেন, রণরঙ্গিনী খড়্গকরে শত্রু নিপাত করিবেন; বৃদ্ধ প্রাণ দিয়া একবার রণস্থলে মাকে নাচাইবে, সর্ব্বস্ব দিয়া এই মহাব্রতের উদ্‌যাপন করিবে।"

রূপনাথ আর কোন প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না, তিনি ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। তখন রণজিৎ ফৌজদারের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, একদিনের জন্য তাঁহাকে সময় দেওয়া হউক, তিনি বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের প্রস্তাবের উত্তর দিবেন। কিন্তু ফৌজদার সাহেব তাঁহার এ প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন না। তিনি রণজিৎ রায়কে চিনিতেন। সে যে এক্ষণে শক্তিসঞ্চয় করিবার জন্যই এইরূপ গোলমাল করিয়া সময় লইতেছে, তাহা তিনি বেশ বুঝিলেন। তখন ফৌজদার সাহেবের পরামর্শে সেনাপতি পরদিনই যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

——(০)——

প্রেম না ভ্রান্তি?

সেই দিন সন্ধ্যার অনতিকাল পরে শঙ্কর একাকী প্রাসাদ-শিখরে দাঁড়াইয়াছিলেন। শুভ্র চন্দ্রকর আসিয়া তাঁহার চিন্তাখিন্ন মুখের উপর পড়িয়াছিল, স্নিগ্ধ বায়ুপ্রবাহ উত্তপ্ত ললাট স্পর্শ করিতেছিল। রূপনাথের উপদেশ তাঁহার হৃদয় ভাবকে অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল, অবিশ্বাসের স্থানে একটু একটু করিয়া অনুতাপের জ্বালা ফুটিয়া উঠিতেছিল। তখন তিনি চন্দ্রার প্রতি অসদ্ব্যবহারের জন্য মনে মনে লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, আপনার দুর্ব্বল হৃদয়কে সংযত করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন। কিন্তু হৃদয় তো শান্ত হয় না? একবার তাহাতে সন্দেহের যে বিষময় বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, শত চেষ্টাতেও তো তাহাকে নির্ম্মূল করা যায় না? যাহা প্রত্যক্ষ, তাহাতে অবিশ্বাস করিয়া অপ্রত্যক্ষে বিশ্বাস স্থাপন কঠোর সাধনাসাপেক্ষ।

শঙ্কর ভাবিতেছিলেন, "জীবন কি ক্ষণভঙ্গুর; তাহাতে প্রেম, ভালবাসা, প্রণয় কি ক্ষণস্থায়ী? বিশ্ব অনন্ত—কাল

অনন্ত; সেই অনন্তের নিকট মানবজীবন কত ক্ষুদ্র—কত তুচ্ছ? এই ক্ষুদ্র জীবন লইয়া অনন্তের বক্ষে প্রেমের—প্রণয়ের অভিনয় কি ভ্রম? ইহা অনন্ত সাগরবক্ষে এক বিন্দু বারির চঞ্চল নৃত্য নয় কি? কিন্তু এই তুচ্ছ বালুকা-কণা-সদৃশ জীবন কি মহান্ কার্য্যসূত্রে আবদ্ধ? এ সূত্রের শেষ নাই—পরিমাণ নাই; এই ক্ষুদ্র জীবন লইয়া অনন্ত কাল এই অনন্তসূত্রের অনুসরণ কি ভয়ানক! বার বার প্রত্যাহত, বিতাড়িত, তথাপি নিবৃত্তি নাই। অনন্তের এক বিন্দু সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, অবিশ্বাস-নিপীড়িত হতাশ হৃদয় লইয়া তাহার অনুসরণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। হায় অনন্ত তুমি কত সুন্দর, কত মনোহর, কত প্রেমময়! কিন্তু তোমার বক্ষে সন্দেহের—নিরাশার এ পৈশাচিক তাণ্ডব কেন? তোমারই অনন্ত প্রেম হৃদয়ে লইয়া ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত সৌন্দর্য্যে, অনন্ত প্রেমে মগ্ন হই না কেন?”

শঙ্কর মুগ্ধ নেত্রে ঊর্দ্ধে চাহিলেন। দেখিলেন, উপরে অনন্ত আকাশ; আদিহীন, অন্তহীন, সীমাশূন্য নির্ম্মল নীলাকাশ। তাহাতে চন্দ্র হাসিতেছে, নক্ষত্র জ্বলিতেছে, তরল মেঘখণ্ড সেই অনন্ত সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। নিম্নে চাহিলেন; দেখিলেন, নীচে অনন্ত বিশ্ব—কৌমুদী-সম্পাত-প্রফুল্লা অনন্ত পৃথিবী। শঙ্কর ভাবিলেন, “হায় অনন্ত!” সহসা

তাঁহার দৃষ্টি দূর প্রান্তরে নিপতিত হইল। দেখিতে পাইলেন, সেই বিশাল-প্রান্তর ব্যাপিয়া জ্যোৎস্না-প্লাবিত মোগল শিবির-মালা শুভ্র সাগরতরঙ্গবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, শিবিরশিরে অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত মহম্মদীয় কেতন পত্ পত্ শব্দে উড়িতেছে। শঙ্কর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন,"জানি না মা জন্মভূমি! কালি তোমার উত্থান অথবা চিরপতন হইবে!" দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার নেত্রপ্রান্তে গড়াইয়া পড়িল। তিনি স্থির দৃষ্টিতে মোগল শিবিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সহসা মৃদু অলঙ্কারশিঞ্জন শুনিয়া শঙ্কর ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, পশ্চাতে দাঁড়াইয়া চন্দ্রা। শঙ্করের হৃদয় উথলিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। কেবল নীরবে চন্দ্রার দিকে চাহিয়া রহিলেন; চন্দ্রাও নীরবে অনিমিষ লোচনে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। উভয়েই স্থির, ধীর, নীরব। উপর হইতে অনন্ত নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে এই প্রণয়িযুগলের নীরব অভিনয় দেখিতে লাগিল।

প্রথমে শঙ্কর কথা কহিলেন। বলিলেন,—"এ সময়ে তুমি এখানে কেন, চন্দ্রা?"

চন্দ্রা কোন উত্তর করিল না, উত্তর করিবার শক্তিও বুঝি তখন তাহার ছিল না। শঙ্কর বলিলেন,—"আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। তোমাকে বলিবার একটা কথা আছে।"

একটা কথা! এত দিনের পর দেখা, সে দেখার পর শুধু একটা কথা! চন্দ্রা কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—"কি কথা?"

শঙ্কর বলিলেন,—"তোমাকে আমি ভালবাসিয়াছিলাম, —বাসিয়াছিলাম কেন, এখনও ভালবাসি। সেজন্য তুমি আমাকে——"

একটু থামিয়া, স্বরটা একটু পরিষ্কার করিয়া শঙ্কর বলিলেন,—"সে জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে কি?"

চন্দ্রা মৃদুস্বরে বলিল,—"কেন তুমি কি করিয়াছ?"

শঙ্কর বলিলেন,—"কি করিয়াছি, তাহা আমিই বুঝিতে পারি না; কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা কর; যদি কখন আমাকে ভালবাসিয়া থাক, তাহা ভুলিয়া যাও।"

চন্দ্রা সেইখানে বসিয়া পড়িল। সকাতর দৃষ্টিখানি শঙ্করের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিল,—"কেন আমি কি অপরাধ করিয়াছি?"

শঙ্কর বলিলেন,—"কি করিয়াছ, তাহা আমি বলিতে পারিব না; যাহাতে তুমি ব্যথা পাও, তেমন কাজ আর করিব না। আর আমি তোমার সুখের পথে বাধা হইব না।"

চন্দ্রা, তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"কেন তুমি এমন কথা বলিতেছ? আমি কি করিয়াছি? বল তুমি, কি করিলে তোমার মনের মত হইতে পারিব।"

শ। তাহা আর হয় না চন্দ্রা!

চ। কেন?

শ। কেন তাহা বলিতে পারিব না। আমি এখন জীবন্মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান।

চন্দ্রা সবিস্ময়ে বলিল,—"সে কি?"

শঙ্কর অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"ঐ দেখ।"

চন্দ্রা বলিল,—"ও কি?"

শ। মোগল শিবির।

চ। কবে যুদ্ধ হইবে?

শ। কাল।

চ। তুমিও যুদ্ধে যাইবে?

শ। হাঁ যাইব।

চন্দ্রা আর কিছু বলিল না, কেবল নতবদনে বসিয়া রহিল, অশ্রুপ্রবাহে তাহার বক্ষোবসন সিক্ত হইতে লাগিল। শঙ্কর নীরবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু সে মুখে অবিশ্বাসের কোন ছায়াই দেখিতে পাইলেন না; তাহাতে দেখিলেন, কেবল শান্ত সৌন্দর্য্য, কেবল ভালবাসার স্নিগ্ধ লাবণ্য। দেখিয়া শঙ্করের কত কথাই মনে পড়িল; সেই বালিকা চন্দ্রা, সেই তাহার সরল হাস্যচ্ছবি, সেই তাহার বালিকাসুলভ চাঞ্চল্য,—তাহার পর সেই

কিশোরী চন্দ্রা—শান্ত নম্র, করুণার—সরলতার প্রতিমূর্ত্তি চন্দ্রা,—শঙ্করের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। স্নেহপরিপ্লুত কণ্ঠে ডাকিলেন,—"চন্দ্রা!"

সজল দৃষ্টিখানি তুলিয়া চন্দ্রা বলিল,—"কি?"

শ। কি ভাবিতেছ?

চ। কিছু না।

শ। যুদ্ধের কথায় তোমার কি ভয় হইয়াছে?

চ। না।

শ। এ যুদ্ধের পরিণাম কি জান?

চ। জানি।

শ। কি জান?

চ। মুসলমানের জয়।

শ। আর?

চ। আর আমাদের পরাজয়।

শ। আমাদের?

চ। হাঁ আমাদের—আমাদের দেশের।

শ। দেশ কি তোমাদের?

চ। আমাদের দেশ—আমাদের নয় তো কার?

শঙ্কর একবার ঊর্দ্ধে চাহিলেন, একবার দূর শিবিরশীর্ষে মোগল-পতাকার চঞ্চল নৃত্য দেখিলেন। মনে মনে বলিলেন,

"হায়, কতদিনে বাঙ্গালী বলিতে শিখিবে আমাদের বাঙ্গাল —আমাদের দেশ!" তারপর চন্দ্রার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, —"কেবল পরাজয় নহে চন্দ্রা, এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ। এ যুদ্ধ হইতে আর কেহ ফিরিবে না। অন্যে ফিরিলেও রূপনাথ বা শঙ্কর আর ফিরিবে না।"

শঙ্কর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

চন্দ্রা বলিল,—"সে কথা আমাকে কেন বলিতেছ?"

শ। তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও।

চ। আমি যাইব না।

শ। কেন?

চ। সেখানে আমার স্থান নাই।

শ। কিন্তু এখানে থাকিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। সম্ভবতঃ আমাদের পরাজয়ের পর মুসলমানেরা প্রাসাদ আক্রমণ করিবে।

চ। তথাপি আমি যাইব না।

শ। তাহা তোমার ইচ্ছা, কিন্তু যাইলেই ভাল হইত।

চ। কিসে ভাল হইত?

শ। মুসলমানের হাতে পড়িতে হইত না।

চ। তাহার অপেক্ষাও বাড়ীতে আমার শত্রু আছে।

শঙ্কর রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসিলেন,—"সে কে?"

চ। সে—সে রামরূপ।

শঙ্কর দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। চন্দ্রা সেই ভাবে সেইখানেই বসিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্রকিরণ পশ্চিমাকাশে মিলাইয়া গেল। চন্দ্রা উঠিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

——•:):*:(:•——

উল্‌টা বুঝিলি রাম।

রামরূপ ভাবিল, যখন বাধিয়াছে, তখন ইহাকে একটু ভাল করিয়া বাধানই ঠিক্। আমি এত করিয়া কাদা মাখিলাম, আর শেষে কৃষ্ণকান্ত যে বড় মাছটা ধরিবে, তাহা কখনই হইবে না। এত বড় ক্ষমতাটা পাইলে পার্ব্বতীই যে আমাকে মনে রাখিবে, তাহারই বা স্থির কি। অতএব জালের খেই গুলা নিজের হাতে রাখিয়া কাজ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য, পরের হাতে যাওয়া ভাল নয়। বিশেষতঃ চন্দ্রাকে হাত করা চাই-ই। সে এখন যেখানে গিয়া পড়িয়াছে, এই সময় একটু কৌশল না খাটাইলে শেষে তাহাকে পাওয়া বড় কঠিন হইবে।

এই সকল ভাবিয়া রামরূপ, পার্ব্বতীকে বলিল,—"আমি এক বার গোপনে উভয় পক্ষের উদ্যোগ আয়োজনটা দেখিয়া আসি।"

পার্ব্বতী তাহার গুপ্ত অভিসন্ধি কতকটা বুঝিল, কিন্তু

কিছু বলিল না। তখন রামরূপ গভীর রাত্রিকালে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া মোগলশিবিরের উদ্দেশে যাত্রা করিল। কিন্তু সোজা পথে যাইবার উপায় নাই, চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিতেছে। গ্রাম হইতে কাহারও বাহিরে যাইবার বা বাহির হইতে ভিতরে আসিবার অধিকার নাই। অগত্যা রামরূপ এক খানা ক্ষুদ্র নৌকা ঠিক করিল এবং আপনি ছদ্ম-বেশী মাঝি সাজিয়া একা দাঁড় বাহিয়া চলিল।

ঘুরিয়া ফিরিয়া নৌকাখানা নদীর বাঁকের নিকট উপস্থিত হইল। সেখানে শঙ্খেশ্বরী দক্ষিণ মুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রাম-খানাকে বেষ্টন করিয়া পশ্চিম মুখে ছুটিয়াছে। রামরূপের নৌকা সেই বাঁকের মাথায় উপস্থিত হইলে তীর হইতে এক জন প্রহরী হাঁকিল,—"কে যায়?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া রামরূপ উত্তর করিল,—"আমি নয়ান মাঝি।"

প্রহরী বলিল,—"যাইবার হুকুম নাই, নৌকা ফেরাও।"

রামরূপ তখন নৌকা ফিরাইয়া তাহাকে তীরসংলগ্ন করিল এবং প্রহরীর নিকট উপস্থিত হইয়া, অনেক মিনতি করিয়া বলিল, তাহার স্ত্রীর কঠিন পীড়া; সে তাহার বাপের বাড়ীতে আছে। এই রাত্রির মধ্যে যাইতে না পারিলে তাহার সহিত দেখা হয় কি না সন্দেহ। কিন্তু প্রহরী কিছু-

তেই ছাড়িল না। তখন রামরূপ একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল,—"ভাই! যখন কিছুতেই ছাড়বে না, তখন আর লুকোচুরীতে কাজ কি। আমি অনেক কষ্টে দু'শো খানি টাকার সংগ্রহ করেছিলাম। ইচ্ছা ছিল, একটা বে থা করবো। কিন্তু এখন যে রকম ব্যাপার দেখ্‌চি, তাতে তো দু একদিনের মধ্যেই টাকাগুলো মুসলমানের হাতে পড়্‌বে। তাই সেগুলা যাতে রক্ষা পায় তার একটা উপায় দেখ্‌তে যাচ্চি। ধরমপুরে আমার এক পিসীর বাড়ী; মনে করেছি, এগুলা সেইখানেই রেখে আস্‌ব। তা' তুমি যখন কিছুতেই ছাড়্‌বে না, তখন তুমি তার অর্দ্ধেকগুলা নাও, বাকী অর্দ্ধেক আমি রেখে আসি।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই রামরূপ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে কতকগুলা টাকা বাহির করিয়া গুণিতে বসিল। প্রহরী সতৃষ্ণনয়নে সেগুলার দিকে চাহিয়া রহিল। গণনা শেষ হইলে রামরূপ একশত টাকা লইয়া প্রহরীর সম্মুখে রাখিল। প্রহরী একবার সেই শুভ্রোজ্জ্বল রজত-মুদ্রাগুলির দিকে আরবার রামরূপের দিকে চাহিতে লাগিল। শেষে তাহার কর্ত্তব্যপালন অপেক্ষা সম্মুখস্থ এই টাকাগুলির মর্য্যাদা রক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত বোধ হইল। তখন সে রামরূপকে দ্রুত পলায়ন করিতে আদেশ দিয়া টাকাগুলা কাপড়ে বাঁধিতে

লাগিল। রামরূপ দ্রুতপদে গিয়া নৌকায় উঠিল। অন্ধকারে প্রহরী তাহার হর্ষোৎফুল্ল মুখখানা দেখিতে পাইল না। নৌকা আবার নিঃশব্দে দ্রুতবেগে চলিল।

গ্রামপ্রান্তে আবার একজন প্রহরী রামরূপকে আট-কাইল। কৌশলী রামরূপ আবার তাহাকে অর্থদানে সন্তুষ্ট করিয়া নৌকা চালাইল। নির্ব্বোধ প্রহরীদ্বয় বুঝিল না, তুচ্ছ অর্থের লোভে আজি তাহারা কি সর্ব্বনাশ করিল।

গ্রাম ছাড়াইয়া রামরূপ আরও অনেকদূর গেল। শেষে একটা ক্ষুদ্র জঙ্গলের পার্শ্বে গিয়া নৌকা বাঁধিল। সেই জঙ্গলের পরই বিস্তৃত প্রান্তর। সেখান হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ উত্তরে মোগল শিবির। তখন চন্দ্র অস্ত গিয়াছে, অন্ধকারে প্রান্তরবক্ষ আচ্ছন্ন হইয়াছে। কেবল সেই অন্ধকারাবৃত প্রান্তরবক্ষে দূর মোগল-শিবির হইতে ক্ষীণা-লোক-রশ্মি দৃষ্ট হইতেছে। সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া রামরূপ দ্রুতপদে চলিল।

শিবিরের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া রামরূপ একবার দাঁড়াইল। দেখিল, শিবিরের চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে মশাল জ্বলিতেছে; মশালের নিকটে রক্তবর্ণ পরিচ্ছদধারী যমদূতসদৃশ এক একজন প্রহরী পাহারা দিতেছে। মশালের আলোকে তাহাদের বন্দুকের অগ্রভাগ ঝলসিতেছে। দেখিয়া রাম-

রূপের ভয় হইল; সে আর অগ্রসর হইবে কি পশ্চাৎপদ হইবে, সহসা স্থির করিতে পারিল না। কিন্তু প্রহরীর সতর্কদৃষ্টি তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছিল। একজন প্রহরী চীৎকার করিয়া বলিল,—"কোন্ হ্যায় ?"

সে বজ্রনির্ঘোষতুল্য স্বর শুনিয়াই রামরূপ চমকিয়া উঠিল। কি উত্তর করিবে, স্থির করিতে না করিতে দুইজন প্রহরী আসিয়া তাহাকে ধরিল। রামরূপ জড়িত স্বরে বলিল,—"আমি শত্রু নহি।"

প্রহরীরা সে কথা শুনিল না, ধমক্ দিয়া বলিল,—"চুপ্ রও কাফের।"

অগত্যা রামরূপ চুপ্ করিল। তখন প্রহরীরা তাহাকে ধরিয়া ধাক্কা দিতে দিতে শিবিরের নিকট আনয়ন করিল। দেখিতে দেখিতে আরও কয়েকজন প্রহরী আসিয়া জুটিল। একজন রামরূপকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক তুলিল; রামরূপ কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"দোহাই মিঞা সাহেব, আমায় মারিও না। তোমাদের পয়গম্বরের দোহাই, আমি শত্রু নহি। তোমাদের ফৌজদারের নিকট সংবাদ দাও।"

তখন একজন প্রহরী তাহাকে মারিতে নিষেধ করিয়া সেনাপতির নিকট সংবাদ দিতে ছুটিল। উপস্থিত প্রহরিগণ

রামরূপকে লইয়া কৌতুক করিতে লাগিল। এক একজন পরিহাস করিয়া বন্দুক তুলিলেই রামরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়ে, প্রহরীরা হো হো শব্দে হাসিয়া উঠে। রামরূপ ভাবিল, কি বিপদেই আজি পড়িলাম।

সেনাপতি সাহেব সুসজ্জিত শিবির মধ্যে বসিয়া সিরাজির সহিত অপ্সরাকণ্ঠের সঙ্গীত-সুধাপানে নিবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় প্রহরী তাঁহাকে কুর্নিশ করিয়া জানাইল যে, একটা কাফের চুপে চুপে শিবিরে আসিতেছিল, সে ধরা পড়িয়াছে। সেনাপতি সুরাবিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন,—"শির লে আও।"

প্রহরী কুর্নিশ করিয়া যাইতে উদ্যত হইলে তিনি আবার আদেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন,—"আজ কয়েদে রাখ, কাল হাজির করিও।"

প্রহরী চলিয়া গেল। সেনাপতি সাহেব এক গ্লাস সিরাজি পান করিয়া বলিলেন,—"কাফের জাহান্নমে যাউক, ঠুংরী চালাও।" নর্ত্তকীগণ অপ্সরাকণ্ঠে আবার ঠুংরী ধরিল।

এদিকে প্রহরী আসিয়া সকলকে সেনাপতির আদেশ জানাইল। তখন তাহারা রামরূপকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া কড়া পাহারায় রাখিয়া দিল। রামরূপ মনে মনে বলিল,—"উল্টা বুঝিলি রাম।"

নবম পরিচ্ছেদ।

অনুতাপ না প্রতিহিংসা?

ঠিক্ সেই সময়ে পার্ব্বতী আপনার কক্ষ মধ্যে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল "রামরূপ যাইবে, কৃষ্ণকান্ত যাইবে, শঙ্কর যাইবে। থাকিবে কে? কেহই না। রামরূপ তো একটা পশু, সে যাইলেই কি, থাকিলেই কি? আর কৃষ্ণকান্তের তো কথাই নাই। কিন্তু শঙ্কর?" পার্ব্বতীর বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিল, "এ কি করিলাম? শঙ্কর যদি গেল, তবে থাকিল কে—রহিল কি? কাহার জন্য আমার এই ভীষণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান? কিন্তু শঙ্কর—শঙ্কর আমার কে? সে আমার সর্ব্বস্ব—না না শঙ্কর আমার শত্রু। সে পদে পদে আমাকে অবমানিত—পদদলিত করিয়াছে; আমার সর্ব্বস্ব চুরী করিয়া আমাকে পথের কাঙ্গালিনী সাজাইয়াছে; আমাকে পাপের পথে টানিয়া আনিয়া সে কৃতঘ্ন আপনি সরিয়া গিয়াছে; আমার বুকে তুষের আগুণ জ্বালাইয়া সে নিষ্ঠুর দূর হইতে হাসিতে হাসিতে আমার যন্ত্রণা দেখিয়াছে; সহানুভূতির এক-

বিন্দু বারি দিয়াও সে আমার যন্ত্রণা নিবারণের চেষ্টা করে নাই। সে আমার ভীষণ শত্রু, সে-ই আমার প্রধান লক্ষ্য; তাহাকে পূর্ণাহুতি দিয়া এ মহাযজ্ঞের সমাপ্তি করিব।"

পার্ব্বতীর নয়নে প্রতিহিংসার বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল, দন্তে অধর নিষ্পেষিত হইতে লাগিল, হস্তদ্বয় দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হইল। সে অস্থির ভাবে কক্ষ মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার এ ভাব অধিকক্ষণ থাকিল না। অল্পক্ষণ পরেই তাহার হৃদয়ের রোষাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া আসিল, প্রজ্বলিত নেত্র সজল হইল, দশন-পীড়িত অধর কাঁপিয়া উঠিল। পার্ব্বতী উভয় হস্তে বক্ষ চাপিয়া শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল। অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"শঙ্কর! শঙ্কর! কেন তুমি এ কালসাপিনীর মস্তকে পদাঘাত করিলে?"

সহসা পার্ব্বতী চাহিয়া দেখিল, তাহার সম্মুখে কৃষ্ণকান্ত। কৃষ্ণকান্ত গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন,—"পার্ব্বতি!"

পার্ব্বতী উত্তর করিল,—"কি?"

কৃ। শঙ্কর তোমার কে?

পা। কেহই নয়।

কৃ। সত্য কথা বল।

পা। বলিব না।

কৃষ্ণকান্ত লাফাইয়া শয্যার উপর উঠিলেন। তার পর

দৃঢ় মুষ্টিতে পার্ব্বতীর কেশগুচ্ছ ধরিয়া বলিলেন,—"পাপীয়সি! শঙ্কর তোর জার।"

পার্ব্বতী তীব্র দৃষ্টিতে কৃষ্ণকান্তের মুখের দিকে চাহিল; মুক্তকণ্ঠে বলিল,—"জার নহে, শঙ্কর আমার সর্ব্বস্ব।"

কৃষ্ণকান্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পার্ব্বতীর কেশ ত্যাগ করিলেন। শয্যা হইতে অবতরণ করিয়া বলিলেন,—"এতদিনে সব বুঝিয়াছি। মূর্খ আমি, কুলটার চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিয়াছি। আর যাহা নিজের জীবন হইতেও মূল্যবান্, সহস্র বৎসরের কঠোর সাধনাতেও যাহা দুর্ল্লভ, পাষণ্ড আমি, দেশের সেই সুখের—সেই স্বাধীনতার মস্তকে বজ্রাঘাত করিয়াছি। তোমার অপেক্ষা পার্ব্বতি, আমি মহাপাপী,—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে শঙ্করের—সেই মহাপাপীর শাস্তির প্রয়োজন।"

পার্ব্বতী স্থিরকণ্ঠে বলিল,—"তবে শুন, শঙ্কর নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ। সে ইচ্ছা করিয়াই আমার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে নাই।"

কৃষ্ণকান্ত তীব্রস্বরে বলিলেন,—"যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছে। ধর্ম্মনষ্ট করে নাই, কিন্তু প্রেমের ফাঁদ পাতিয়া পরস্ত্রীর উত্তম ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছে।"

গর্জ্জন করিয়া পার্ব্বতী বলিল,—"মিথ্যা কথা। শঙ্কর

দেবতা; সে আপনিই পাপের জাল ভেদ করিয়া পলাইয়াছে। সে আমাকে মজায় নাই, আমিই——"

পার্ব্বতী একটু থামিল, একটু ভাবিল। তারপর দুই হাতে বুক চাপিয়া বলিল,—"না, যাও, সে-ই আমাকে মজাইয়াছে, অবলার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে। যাও— পাপীর শাস্তি দাও; শঙ্করের রক্তে স্নান করিয়া সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।"

কৃষ্ণকান্ত একবার তীব্রদৃষ্টিতে পার্ব্বতীর রোষদৃপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া বেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পার্ব্বতী সেই ভাবেই বলিয়া ডাকিয়া বলিল,—"আরও শুন, যদি যথার্থ পাপীকে শাস্তি দিতে চাও, তবে রামরূপই সে শাস্তির উপযুক্ত পাত্র। সে কেবল আমার ধর্ম্মনষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সে ঘোর বিশ্বাসঘাতক।"

কৃষ্ণকান্ত তখন বাটীর বাহির হইয়া গিয়াছেন। পার্ব্বতীর কথা তিনি শুনিতে পাইলেন না।

কৃষ্ণকান্ত যখন বাটীর বাহিরে আসিলেন, তখন সংসারটা তাঁহার চতুর্দ্দিকে সশব্দে ঘুরিতেছিল, রজনীর অন্ধকারের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার একটা প্রেতমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে ভৈরবনৃত্য করিতেছিল, চারিদিক হইতে অবিশ্বাসের —প্রতারণার অট্টহাস্যধ্বনি আসিয়া তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত

হইতেছিল। তিনি উন্মাদের ন্যায় অস্থির পদক্ষেপে মোগল-শিবিরের দিকে চলিলেন।

কিয়দ্দূর যাইতেই জনৈক প্রহরী তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। তিনি সরোষে বলিলেন,—"পথ ছাড়িয়া দাও।"

প্রহরী বলিল,—"ছাড়িতে পারিব না।"

কৃ। কেন?

প্র। হুকুম নাই।

কৃ। কাহার হুকুম?

প্র। সেনাপতির।

কৃষ্ণকান্ত ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন,—"সেনাপতি কে?"

প্রহরী কৃষ্ণকান্তকে চিনিত। সে বলিল,—"যাহার সর্ব্বনাশের জন্য এত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছ।"

কৃষ্ণকান্ত সক্রোধে বলিলেন,—"চুপ্ রহ সয়তান।"

প্রহরী কোন উত্তর করিল না। তখন কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—"আমাকে সেনাপতির নিকট লইয়া চল।"

প্রহরী একটা সাঙ্কেতিক শব্দ করিল। তৎক্ষণাৎ আর একজন প্রহরী আসিয়া সেইখানে দাঁড়াইল। প্রথম প্রহরী কৃষ্ণকান্তকে লইয়া শঙ্করের নিকট চলিল।

দশম পরিচ্ছেদ ।

—— ০:০:*:০ ——

পাপী কে ?

এক আলোক-সমুজ্জ্বল কক্ষে বসিয়া শঙ্কর ও রূপনাথ যুদ্ধ বিষয়ক পরামর্শ করিতেছিলেন, এমন সময় প্রহরী কৃষ্ণকান্তকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। কৃষ্ণকান্তকে দেখিয়া শঙ্কর আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, এবং তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রহরী বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

কৃষ্ণকান্ত না বসিয়াই বলিলেন,—"গ্রামের বাহিরে যাইতে কে নিষেধ করিয়াছে ?"

শঙ্কর বিনীতভাবে উত্তর করিলেন,—"আমি করিয়াছি।"

কৃ। কি জন্য ?

শ। গ্রাম হইতে কোন লোক বাহিরে গিয়া শত্রুপক্ষের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে পারে।

কৃ। যে ষড়যন্ত্র করিবে, সে কি গ্রামে বসিয়াই তাহা করিতে পারে না ?

শ। পারে, কিন্তু তাহাতে আশঙ্কা অল্প।

কৃষ্ণকান্ত বিদ্রুপের হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি মূর্খ, সেই জন্যই আশঙ্কার অল্পতা অনুমান করিতেছ। ষড়যন্ত্রকারী ভিতরে থাকিলে যতটা অমঙ্গলের সম্ভাবনা, বাহিরে থাকিলে ততদূর আশঙ্কা নাই।"

রূপনাথ বলিলেন,—"অমঙ্গলাশঙ্কা অল্প করিবার জন্যই কি আপনি বাহিরে যাইতে চাহিতেছেন?"

কৃষ্ণকান্ত রোষ-কষায়িত লোচনে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর! এ অনুস্বার বিসর্গের সমস্যা নয়। এ সমস্যার মীমাংসার জন্য স্বতন্ত্র বুদ্ধির প্রয়োজন।"

রূপনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"আপনি এতটা অনুগ্রহ না করিলে বোধ হয় এতদিনে সে অভাবটুকু পূরণ হইয়া যাইত।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—"ঠাকুর! পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া প্রেমের উপাসনা করিতে করিতে দেশোদ্ধার করা যায় না। এ পথে অনেক কণ্টক, অসংখ্য বাধা। কৌশলে সেই সমস্ত কণ্টক উৎপাটিত করিয়া, সেই সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। দেশের সকল লোকই একদিনে তোমার মত হয় না, সকলের হৃদয় তোমার মত স্বার্থবিসর্জ্জনে প্রস্তুত নহে। দেশে কোটি

কোটি লোক—তাহাদের হৃদয় কোটি কোটি ভাবে গঠিত। সেই কোটি-ভাবাপন্ন হৃদয় কি কোন দিন একসূত্রে বদ্ধ হইতে পারে?"

রূপনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"পারে না বলিয়াই বাঙ্গালার পতন অনিবার্য্য।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—"ভুল, ভুল; এত বিভিন্ন হৃদয় কোন দিনই এক হয় না, কোন দেশেরই ইতিহাসে ইহার প্রমাণ নাই। কিন্তু তুমি যদি শক্তিমান্ হও, তোমার হৃদয় যদি সবল হয়, তবে ছলে, বলে, কৌশলে সেই সকল হৃদয়কে দমন করিবার চেষ্টা কর, সেই ভিন্নভাবাপন্ন কোটি হৃদয়কে আপনার শক্তিশালী হৃদয়ের নিকট অবনত করাইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও; দেখিবে আশার সফলতা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাহা করিয়াছ কি? কেবল আপনার হৃদয় পানে চাহিয়া আর সকলকে উপেক্ষা করিয়াছ, কেবল এক একটা নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়াছ, 'হায় বাঙ্গালি!' ঠাকুর! দেশের সকল লোক যে দিন তোমার মত সাধু পুরুষ হইবে, সেই দিন বাঙ্গালী সুখশয্যায় শয়ন করিয়া অনায়াসে দেশের উদ্ধার সাধন করিবে।"

রূপনাথ স্তম্ভিত হৃদয়ে বসিয়া সকল কথা শুনিলেন। তারপর আসন ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকান্তের উভয় হস্ত ধারণ

পূর্ব্বক গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন,—"আপনি জ্ঞানী, আপনি বুদ্ধিমান্, আপনি কার্য্যজ্ঞ; আপনি জানিয়া শুনিয়া কেন এমন কাজ করিলেন?"

কৃ। বলিয়াছি তো, সকলের হৃদয় তোমার মত নহে।

রূ। যাহা হইবার হইয়াছে; কিন্তু এখন রক্ষা করুন। এখনও সময় আছে, উপায় আছে—এ রাজ্য আপনারই, আপনি এ বিপদে সহায় হউন।

কৃ। আর হয় না। রাজ্যে একদিন আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু এখন আর নাই। এখন আমি চাই, দোষীর দণ্ড, পাপীর শাস্তি।

রূ। দেশের মুখ চাহিয়া কি সে সকল ভুলিতে পারেন না?

কৃ। তাহা ভুলিবার নহে। যদি কেহ তোমার স্ত্রীর সর্ব্বনাশ করিয়া, তোমার কুলমানের মস্তকে পদাঘাত করিয়া এইরূপে তোমাকে উপদেশ দিত, তবে তুমি কি তাহা ভুলিতে পারিতে ঠাকুর? তুমি ভুলিলেও আমি ভুলিতে পারিব না।

কৃষ্ণকান্ত, রূপনাথের হস্ত হইতে আপনার হস্ত টানিয়া লইলেন। তারপর শঙ্করের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"এখন অধিক কথার সময় নহে। আমাকে গ্রামের বাহিরে যাইতে দিবে কি না বল?"

শঙ্কর নতমুখে বলিলেন,—"ক্ষমা করিবেন, তাহা হয় না।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—"তবে আমি প্রকাশ্যে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি. আমি ষড়যন্ত্রকারী, তোমাদের শত্রু, আমাকে বধ কর।"

রূপনাথ বলিলেন,—"আপনি যে ষড়যন্ত্রকারী, তাহা অনেকদিন হইতেই জানি, তথাপি আপনাকে আমরা বধ করি না, করিবও না।"

কৃ। ছিঃ, তোমরাই দেশোদ্ধার করিবে?

রূ। আপনি ভুল বুঝিয়াছেন; দেশোদ্ধার আমাদের ব্রত নয়, অত্যাচার দমনই আমাদের মুখ্যব্রত। নতুবা আপনাকে আজিও নিজের বুদ্ধিগৌরবে স্ফীত হইতে হইত না। আমরা জানি, আপনাকে বিনাশ করিলেই এ ষড়যন্ত্রের মূলোচ্ছেদ হইবে না। সত্য বলুন দেখি, এ ষড়যন্ত্রের মূল কি আপনি?

কৃষ্ণকান্ত বদন বিনত করিলেন। রূপনাথ বলিলেন,—"কেবল স্ত্রীহত্যার ভয়েই আমরা এই ষড়যন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করিতে পারি নাই। আপনি জ্ঞানহীন, অন্ধমাত্র, নতুবা একজন বিশ্বাসঘাতক লম্পটের হস্তে আপনার যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নির্দ্দোষীর শাস্তির জন্য এরূপ কুটিল বজ্র উদ্যত করিতেন না।"

কথাগুলা কৃষ্ণকান্তের মর্ম্মে আঘাত করিল। তিনি

নীরবে অবনতবদনে গৃহ হইতে বাহির হইতেছিলেন, শঙ্কর প্রহরীকে ডাকিয়া তাঁহাকে ইচ্ছামত স্থানে রাখিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত আর গ্রামের বাহিরের দিকে না গিয়া আপনার ভবনাভিমুখে চলিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শেষপূজা।

প্রভাতে দিগন্ত কম্পিত করিয়া মোগলশিবির হইতে কামান গর্জ্জিল, 'গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুড়ুম্'; সঙ্গে সঙ্গে ছয় সহস্র মোগলসৈন্য 'আল্লা হো আকবর' রবে প্রভাতগগন প্রতিধ্বনিত করিয়া অগ্রসর হইল। হিন্দুসৈন্যগণও প্রস্তুত হইয়া পূর্ব্ব হইতেই অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারাও 'জয় জগদীশ হরে' গাহিতে গাহিতে শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইল।

তখন মুসলমান পক্ষ হইতে কামানের জলন্তগোলা আসিয়া হিন্দুসৈন্যের উপর পড়িতে লাগিল; হিন্দুপক্ষ হইতেও অগ্নিময় গোলা নিক্ষিপ্ত হইয়া মুসলমান সৈন্য বিধ্বস্ত করিতে থাকিল। ছয় সহস্র মোগলসৈনিকের সহিত দুই সহস্র হিন্দুসৈন্যের ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সৈন্যগণ বন্দুক উত্তোলন করিয়া পরস্পরের উপর গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল। সংখ্যাধিক শত্রুসৈন্যের অগ্নিবাণবর্ষণে

দলে দলে হিন্দুসৈন্য পড়িতে থাকিল। কিন্তু ইহাতে তাহারা কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণে শত্রু বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। রূপনাথ চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। শঙ্কর অগ্রে থাকিয়া সৈন্য পরিচালনা করিতে থাকিলেন।

তারপর যখন উভয় সৈন্য পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইল, তখন সকলে বন্দুক ছাড়িয়া অসি ধারণ করিল। সমবেত হিন্দুসৈন্য একবার উচ্চকণ্ঠে গাহিল, 'জয় জগদীশ হরে।' তারপর তাহারা অসিহস্তে ভীম পরাক্রমে সেই শত্রুসৈন্য-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে পাইক সৈন্যগণও তাহাদের অনুসরণ করিল। কিন্তু এবার বিপক্ষগণ রীতিমত বূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ করিতেছিল, হিন্দুসৈন্যগণ তাহাদের সে বূহ ভেদ করিতে পারিল না। পাষাণগাত্র-প্রহত সাগরতরঙ্গবৎ তাহারা বার বার প্রতিহত ও পশ্চান্নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

সমস্তদিন যুদ্ধ হইল। অনেক সৈন্য মরিল, আহত হইল, রক্তস্রোতে রণস্থল প্লাবিত হইল, আহত ও মৃত সৈনিকের দেহে প্রান্তর পরিপূরিত হইয়া গেল; আহতের আর্ত্তনাদ, বীরের হুঙ্কার, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা মিলিত হইয়া রণভূমি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। সন্ধ্যার সময় সে দিনের

মত যুদ্ধ স্থগিত হইল। জয় পরাজয় নির্ণীত হইল না। কিন্তু হিন্দুপক্ষ সংখ্যায় অল্প হইয়া পড়িল।

পরদিন প্রভাতে আবার রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। রূপনাথ সমস্ত রাত্রি যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। প্রভাতের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গৃহে আসিয়া কমলাকে বলিলেন,—"কমলা! আজি শেষ দিন।"

কমলা অকম্পিতকণ্ঠে বলিল,—"বুঝিয়াছি।"

রূপনাথ বলিলেন,—"কিন্তু কমলা! আমার একটী শেষ অনুরোধ আছে।"

কমলা বলিল,—"বল,এখনও কি মরিতে বারণ করিবে?"

রূপনাথ বলিলেন,—"না। কিন্তু কমলা! তুমি বাঙ্গালীর মেয়ের মত মরিও না। স্বামীর সহিত জ্বলন্ত চিতায় দগ্ধ হইলে যদি অক্ষয় বৈকুণ্ঠ থাকে, তাহা থাক, তুমি তাহার লোভ করিতে পাইবে না। অন্ততঃ একজন শত্রু মারিয়াও তোমাকে মরিতে হইবে, ইহাই আমার শেষ অনুরোধ।"

কমলা বলিল,—"পারিব কি?"

রূপনাথ বলিলেন,—"কেন পারিবে না? সে দিনকার কথা কি মনে নাই কমলা?"

ম্লান হাসি হাসিয়া কমলা বলিল,—"তাহাই হইবে।"

রূপনাথ সহর্ষে কমলাকে আলিঙ্গন করিলেন। শক্তির

সহিত কর্ম্মের শেষ সম্মিলন হইল। রূপনাথ বলিলেন,—"আশীর্ব্বাদ করি কমলা, বৈকুণ্ঠের উপরেও যদি কোন পুণ্য লোক থাকে, তবে তুমিই তাহার অধিকারিণী।"

রূপনাথ বিদায় হইলেন। কমলা মনে মনে বলিল,—"আমি বৈকুণ্ঠ চাহি না, তোমার আদেশই আমার বৈকুণ্ঠ, তুমিই আমার বৈকুণ্ঠেশ্বর।"

কমলা বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ ভাবিল। তারপর উঠিয়া সেই মরিচাধরা তরবারি খানা খুঁজিয়া বাহির করিল। সবিস্ময়ে দেখিল তাহাতে আর মরিচার নাম মাত্রও নাই, তাহা এক্ষণে সুশাণিত, সুতীক্ষ্ণ। কমলা বুঝিল, ইহা স্বামীরই কাজ। তখন তরবারি যথাস্থানে রাখিয়া সে স্নান করিতে গেল। স্নানান্তে চওড়া লালপেড়ে শাড়ী পরিল, সিঁথায় উজ্জ্বল করিয়া সিঁদুর দিল, অলক্তকে পদদ্বয় রঞ্জিত করিল, সুদীর্ঘ কুন্তলরাশি এলাইয়া দিল, মৃণাল-জড়িতা ফণিনীর ন্যায় কৃষ্ণ কেশদাম তাহার পৃষ্ঠ অংস ঢাকিয়া দুলিতে লাগিল। তারপর কমলা দ্বাররুদ্ধ করিয়া পূজা করিতে বসিল।

পূজা প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় বাহিরে একটা কোলাহল উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে কে দ্বারে ভীষণ আঘাত করিল। একবার, দুইবার, তিনবার আঘাতে দ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কমলা দেখিল, ভগ্ন দ্বারপার্শ্বে চারিজন মুসলমান। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার বক্ষঃ স্পন্দিত হইল, মুহূর্ত্তের জন্য সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই স্বামীর আদেশ মনে পড়িল, তাঁহার শেষবাসনা পূর্ণ করিবার প্রতিজ্ঞা স্মরণ হইল। কমলা মনে মনে ডাকিল,—"কোথায় আমার দেবতা! তোমার দাসীর হৃদয়ে বল দাও। চিরদিন তোমারই পূজা করিয়া আসিয়াছি; আজি শেষ দিনে, তোমারই আদেশে শত্রুশোণিতে একবার মা'র পূজা করিব।"

তখন মুসলমানেরা ঘরের ভিতর আসিয়াছে। মুহূর্ত্তমধ্যে কমলা কটিদেশে বস্ত্রাঞ্চলটা জড়াইয়া ফেলিল, মুহূর্ত্তমধ্যে সিন্দুররঞ্জিত তরবারি খান তুলিয়া লইয়া 'মার্' 'মার্' শব্দে মুসলমানগণের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। হতভাগিনী বঙ্গভূমি বুঝি সেই দিন একবার শেষ হাসি হাসিয়া উঠিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—— •:):•:(:• ——

ঘাতক না বলি ?

এদিকে যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে বন্দী রামরূপকে লইয়া প্রহরী ফৌজদারের দরবারে হাজির করিল। পূর্ব্বদিন রামরূপ শিবিরের একপার্শে পড়িয়া এই ভীষণ যুদ্ধ দেখিতেছিল। চারিদিক হইতে জলন্ত গোলা গুলি আসিয়া শিবিরের নিকট পড়িতেছিল। রামরূপ প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে করিতেছিল, এখনই উহার একটা আসিয়া তাহার সকল আশা ভরসার শেষ করিয়া দিবে। হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ, পলায়নেরও উপায় নাই। অগত্যা রামরূপ উদ্বেগে আশঙ্কায় মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিল। এক একটা জলন্তগোলা ছুটিতে দেখিলেই সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সভয়ে মৃত্যুর করালমূর্ত্তি কল্পনা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সৌভাগ্য বলেই হউক অথবা দেশের দুর্ভাগ্য বলিয়াই হউক, তাহা ঘটিল না। যুদ্ধ শেষ হইলে সে প্রহরীর নিকট অনেক কাঁদাকাটা করিল, এবং পরদিন যুদ্ধকালে যাহাতে এইখানে পড়িয়া থাকিতে না হয়, তজ্জন্য

অনেক অর্থের লোভ দেখাইয়া প্রহরীকে একটা উপায় করিতে বলিল। প্রহরী সান্ত্বনা দিয়া পরদিন যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে তাহাকে ফৌজদারের নিকট উপস্থিত করিল।

ফৌজদার সাহেব রামরূপকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। তৎক্ষণাৎ বন্ধনমুক্ত করিয়া তাহার বক্তব্য শুনিতে চাহিলেন। রামরূপ বলিল,—"আমার সঙ্গে দুই শত সৈন্য প্রেরণ করুন।"

রস্তম আলি বলিলেন,—"তুমি সৈন্য লইয়া কি করিবে?"

রা। কৌশলে আপনাদের যুদ্ধজয় করাইয়া দিব।

র। কেন, আমরা কি যুদ্ধজয় করিতে পারিব না?

রা। কেবল সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভ করা কঠিন হইবে।

র। কেন?

রা। একজনও হিন্দুসৈন্য জীবিত থাকিতে যুদ্ধজয়ের আশা নাই।

র। একজনও জীবিত থাকিবে না।

রা। কিন্তু যাহার জন্য আপনার এত আয়োজন, তাহাকে ততক্ষণে আর পাইবেন না।

র। কাহাকে পাইব না?

রা। কমলাকে।

র। সে কোথায় যাইবে?

রা। যুদ্ধে পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিলেই সে—হিন্দু-রমণীরা যাহা করিয়া থাকে, তাহাই করিবে।

র। মরিবে?

রা। নিশ্চয়ই।

র। তাহার পূর্ব্বে তুমি তাহাকে হস্তগত করিতে পারিবে?

রা। দুই শত সৈন্যের সহায়তা পাইলেই পারিব।

র। আর একবার তুমি এই ভার লইয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলে?

রা। তখন আমি উপযুক্ত সাহায্য পাই নাই। বিশেষতঃ এখন সকলেই যুদ্ধে ব্যস্ত।

র। তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম। কিন্তু কেন তুমি এ কাজ করিবে?

রা। আমার স্বার্থ আছে।

র। কি স্বার্থ?

রা। যুদ্ধ শেষ হইলে বলিব।

ফৌজদার সাহেব রামরূপকে বেশ চিনিতেন, সুতরাং তাহার কথায় অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তখন তিনি সেনাপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রামরূপকে দুই শত সৈন্য প্রদান করিলেন। রামরূপ সেই দুই শত সিপাহী লইয়া

সহর্ষে পূর্ব্বোক্ত পথে যাত্রা করিল। লোকে এক ঢিলে দুইটা পাখী মারে, কিন্তু রামরূপ এক ঢিলে অনেকগুলা পাখী মারিবার উদ্যোগ করিল।

অল্পক্ষণ পরেই যুদ্ধ বাধিল। শঙ্কর দেড় সহস্র সৈন্য লইয়া শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হইলেন। রণজিৎ রায় স্বয়ং অশ্বারোহণে আসিয়া সৈন্য-পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সৈন্যগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সেই পঞ্চদশ শত সৈন্যের বাহুতে যেন পঞ্চদশ সহস্র যোদ্ধার বল আসিল। তাহারা অমিতবিক্রমে শত্রুসৈন্য ধ্বংস করিতে লাগিল। তাহাদের সেই উৎসাহ, সেই বিক্রম দেখিয়া বিপক্ষগণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। পর মুহূর্ত্তেই তাহারা ভীমবেগে সেই সৈন্যশ্রেণীর উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে নিষ্পেষিত করিয়া মারিবার জন্য অগ্রসর হইল। অদূরে চারি শত পাইক সৈন্যসহ দাঁড়াইয়া রূপনাথ এই ভীষণ যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। সে দিন তিনি লাঠির পরিবর্ত্তে তরবারি ধারণ করিয়াছেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—— •:※:• ——

আবদুলের পুরস্কার।

প্রভাতে কৃষ্ণকান্ত দেখিলেন, কিয়দ্দূরে নদীর পর-পারে প্রায় একশত নৌকা বাঁধা আছে। দেখিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। তখন ইহার কারণ অনুসন্ধান নিমিত্ত উচ্চ প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন, পূর্ব্ব-দিক হইতে প্রান্তর আচ্ছন্ন করিয়া একদল সৈন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা সংখ্যায় অনুমান সাত আটশত হইবে। দেখিতে দেখিতে তাহারা অনেকদূর আসিয়া পড়িল। কৃষ্ণকান্ত চিনিলেন, ইহারা পাইক সৈন্য। তখন বুঝিলেন, এই জন্যই পরপারে নৌকা রহিয়াছে। কৃষ্ণকান্ত চিন্তিতান্তঃ-করণে যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু কামান ও বন্দুকের ধূমরাশি ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। সহসা তাঁহার দৃষ্টি বাম ভাগে নিপতিত হইল। সবিস্ময়ে দেখিলেন, আর এক দল সৈন্য দক্ষিণ দিক হইতে নদীতীরের

পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। কৃষ্ণকান্ত তাহাদের পরিচ্ছদ দেখিয়াই চিনিলেন, ইহারা মোগল সৈন্য। দেখিলেন, তাহাদের অগ্রে রামরূপ। তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট বদন হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি প্রাসাদ হইতে দ্রুত অবতরণ করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত নদীতীরে দাঁড়াইয়া মোগল সৈন্যগণের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অবিলম্বেই দুইশত সিপাহী সহ রামরূপ তথায় উপস্থিত হইল। কৃষ্ণকান্ত, রামরূপকে বলিলেন;— "এই সকল সৈন্য কোথায় যাইবে ?"

রামরূপ বলিল,—"নগর অধিকার করিতে।"

কৃ। ইহারা তোমার আদেশ পালন করিবে ?

রা। করিবে।

কৃ। ঐ দেখ নদীর ওপারে নৌকাগুলা বাঁধা আছে, ইহাদিগকে ঐ গুলা এপারে আনিতে আদেশ কর।

রা। কেন ?

কৃ। এখনই দেখিতে পাইবে।

তখন রামরূপের আদেশে প্রায় পঞ্চাশ জন সিপাহী নৌকায় আরোহণ করিয়া পর পারে উপস্থিত হইল এবং পর-পারস্থিত নৌকা সকল ফিরাইয়া আনিতে মাঝিদিগকে আদেশ করিল। মাঝিরা কেহ কেহ ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু সিপাহী-দের উদ্যত সঙ্গীন দেখিয়া ভয়ে ভয়ে নৌকা পরপারে আনিতে

বাধ্য হইল। সমস্ত নৌকা আসিলে কৃষ্ণকান্ত দাঁড়ী মাঝি-গণকে চলিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। তাহারা আর কোন কথা না বলিয়া সভয়ে প্রস্থান করিল। কেবল একজন মুসলমান মাঝি সেলাম করিয়া বলিল,—"খোদাবন্দ! আমাদের জানবাচ্ছা মারা যাবে।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—"কোন ভয় নাই, আমি তাহার উপায় করিব।"

মাঝি সভয়ে একবার কৃষ্ণকান্তের মুখের দিকে চাহিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। রামরূপ দেখিল, মাঝির চোক দুটা যেন জ্বলিতেছে। সে মাঝি আর কেহ নহে, আবদুল।

অনতিকাল পরে আট শত পাইক সৈন্য আসিয়া নদীর পর পারে দাঁড়াইল। তাহারা একবার ব্যগ্র দৃষ্টিতে চারিদিকে নৌকার অনুসন্ধান করিল, কিন্তু দেখিল, নৌকা সকল পর পারে, সেখানে দুই শত সশস্ত্র সিপাহী দণ্ডায়মান। তখন তাহারা "মাঝি মাঝি" বলিয়া চীৎকার করিল, তাহাদের সে চীৎকার নদীবক্ষে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সিপাহীগণ হাসিয়া উঠিল। পাইকগণ বুঝিতে পারিল, নৌকা শত্রুরা অধিকার করিয়াছে। এদিকে নদীর একটানা স্রোত, পার হইবার উপায় নাই। তথাপি কয়েকজন পাইক সাহস করিয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ইচ্ছা—পরপারে গিয়া নৌকা

আনিবে। কিন্তু তাহারা অর্দ্ধপথে না আসিতেই রামরূপের আদেশে সিপাহীগণ তাহাদের উপর গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিল। গুলির আঘাতে অনেকেই আহত হইয়া নদীস্রোতে ভাসিয়া চলিল। তখন পাইকগণ আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। তাহারা সতৃষ্ণ নয়নে পর পারের দিকে চাহিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। রামরূপ সেখানে এক শত সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্ট একশত সৈন্য সহ রণজিতের প্রাসাদ আক্রমণার্থ অগ্রসর হইল।

তাহাদের গমনের কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণকান্তের স্মরণ হইল, রণজিৎরায়ের প্রাসাদে চন্দ্রা আছে। স্মরণমাত্র তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। প্রাসাদ লুণ্ঠনকালে সিপাহীগণের হস্তে চন্দ্রা কিরূপ লাঞ্ছিত হইবে, তাহা ভাবিয়া তিনি অস্থির হইলেন। তখন সৈন্যগণকে সাবধানে থাকিতে বলিয়া তিনিও সেই দিকে ছুটিলেন। পার্ব্বতী গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিতেছিল। কৃষ্ণকান্তকে ছুটিতে দেখিয়া সেও গবাক্ষ রুদ্ধ করিল।

এদিকে কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর হিন্দুপক্ষ ক্রমেই দুর্ব্বল হইতে লাগিল, বিপক্ষের প্রবল আক্রমণে তাহাদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইয়া পড়িল। তাহারা কেবল রূপনাথের উৎসাহপূর্ণ বাক্যে উত্তেজিত হইয়াই তখনও প্রাণপণে যুদ্ধ

করিতেছিল, কিন্তু সেই অগণ্য মোগলসৈন্যের সম্মুখে তাহারা কেবল নিষ্পেষিত হইতে লাগিল। তথাপি কেহ পশ্চাৎপদ হইল না। রূপনাথ ব্যগ্রদৃষ্টিতে বারবার পশ্চাতে চাহিতে লাগিলেন, প্রতি মুহূর্ত্তেই পাইক সৈন্যগণের আগমন প্রত্যাশা করিতে থাকিলেন। কিন্তু কেহই আসিল না। শেষে আবদুল আসিয়া যে নির্ঘাত সংবাদ দিল, তাহাতে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। আবদুল তাঁহার নিকট দুই শত সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু রূপনাথ দেখিলেন, যুদ্ধস্থলে সর্ব্বসমেত সাত শতাধিক সৈন্য নাই। ইহার মধ্য হইতে দুই শত সৈন্য দিলে যুদ্ধ আর চলিবে না। অগত্যা তিনি আবদুলের প্রার্থনা পূরণ করিতে পারিলেন না। হতাশ হইয়া আবদুল তখন ক্ষুব্ধ হৃদয়ে, যেখানে শঙ্কর, প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প সৈন্যগণকে পরিচালনা করিতেছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে শঙ্করকে সেলাম করিল। শঙ্কর বলিলেন,—"কি আবদুল?"

আবদুল ঘন ঘন শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে বলিল,—"আমার সেই বখ্‌শিস্‌ দিন।"

শঙ্কর একটু বিস্মিত হইলেন। বলিলেন,—"কি চাও বল?"

আবদুল বলিল,—"আমি কৃষ্ণকান্তের মাথাটা চাই।"

শঙ্কর বলিলেন,—"অন্য প্রার্থনা কর।"

আবদুল দৃঢ়স্বরে বলিল,—"অন্য প্রার্থনা নাই।"

শঙ্কর বলিলেন,—"তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার শক্তি আমার নাই।"

আবদুল বলিল,—"তবে গোলামকে মরিতে হুকুম দিন।"

আবদুলের স্বর অভিমানে ভগ্ন। শঙ্কর স্নেহকোমল কণ্ঠে বলিলেন,—"এ প্রার্থনা কেন আবদুল?"

আবদুল হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল,—"কেন? আবদুল দাঁড়াইয়া মনিবের সর্ব্বনাশ দেখিতে পারিবে না। আজ সে মনিবের কাজ উদ্ধার করিতে পারে নাই। আটশত পাইক তাহার মুখ চাহিয়াছিল, কিন্তু আল্লা জানেন, তাহার কোন ক্ষমতাই ছিল না। সে একা নিরস্ত্র, ঠাকুর গোলোযোগের ভয়ে তাহার হাতে একখানিও অস্ত্র দেয় নাই। তাই বিশ্বাসঘাতকের হুকুমে তাহাকে মনিবের কাজ ফেলিয়া পলাইতে হইয়াছে। আবদুল কাজ করিতে পারে নাই, আর কেন সে বাঁচিবে?"

আবদুল কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার এই স্বার্থশূন্য ক্রন্দনে শঙ্করের হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি বলিলেন,—"আবদুল! স্থির হও।"

অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে আবদুল বলিল,—"আজ গোলাম

একবারে স্থির হইবে। সেলাম হুজুর, এ গোলাম আর ফিরিবে না, আর বখ্‌শিষ্‌ চাহিবে না।"

কথা শেষ করিয়াই আবদুল, নিকটস্থ জনৈক মৃত সৈনিকের এক খান অস্ত্র কুড়াইয়া লইল এবং ছুটিয়া যুদ্ধনিরত সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিল। শঙ্কর ডাকিলেন,—"আবদুল! আবদুল!"

কিন্তু আবদুল তখন সৈন্য-সাগরে মিশিয়া গিয়াছে। শঙ্কর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই একটা ভীম কোলাহল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া বসিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, আবদুল সেই মোগল-সৈন্যশ্রেণী ভেদ করিয়া প্রায় ফৌজদারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, চারিদিক হইতে বিপক্ষগণ তাহাকে বাধা দিবার জন্য চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়াছে। শঙ্কর আর থাকিতে পারিলেন না। আবদুলের অভিমানক্ষুব্ধ শেষ স্বর তখনও তাঁহার কর্ণে বাজিতেছিল,—"গোলাম আর ফিরিবে না।" তিনি আবদুলের রক্ষার্থ সেই দিকে অশ্ব ছুটাইলেন, সৈন্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ ছুটিল।

কিন্তু অধিকদূর না যাইতেই শঙ্কর দেখিলেন, আবদুল ক্ষিপ্রহস্তে ফৌজদারের শরীররক্ষক সিপাহী-চতুষ্টয়ের মস্তক [illegible] করিল। পার্শ্ব হইতে আরও কয়েকজন সিপাহী ছুটিয়া

আসিল, কিন্তু আবদুল উন্মত্তের ন্যায় অসিচালনা করিয়া তাহা-দিগকে ধরাশায়ী করিতে লাগিল। অশ্বপৃষ্ঠস্থিত রস্তমআলি ইহা দেখিলেন। তিনি অশ্ব ছুটাইয়া আসিয়া আবদুলের স্কন্ধ লক্ষ্য করিয়া অসি তুলিলেন। আবদুল একবার তাঁহার দিকে চাহিল; পিতৃঘাতী, পত্নীঘাতী, পুত্রঘাতী আততায়ী শত্রুকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার দৃষ্টি জ্বলিয়া উঠিল; উত্তপ্ত পাঠানশোণিত তাহার শিরায় শিরায় দ্রুতবেগে ছুটিল। সে একবার উচ্চকণ্ঠে ডাকিল,—"আল্লা!" পরক্ষণেই—ফৌজ-দারের উত্থিত অসি তাহার স্কন্ধে না পড়িতেই সে লাফাইয়া উঠিল; মুহূর্ত্তে তাহার অসি চমকিত হইয়া রস্তমআলির স্কন্ধে সবেগে পতিত হইল, ফৌজদার সাহেবের মস্তকহীন দেহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে গড়াইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ চারিদিক হইতে শত অসি উত্থিত হইল; ক্ষণ মধ্যেই আবদুলের রক্তাক্ত দেহ ফৌজদার সাহেবের দেহের উপর পতিত হইল। শঙ্কর নয়ন মার্জ্জনা করিলেন।

এদিকে যুদ্ধনিরত রণজিৎ যখন শুনিলেন যে, প্রাসাদ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, তখন তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি শঙ্করকে ডাকিয়া তাঁহাকে প্রাসাদরক্ষার্থ যাইতে আদেশ করিলেন। শঙ্কর তাঁহাকে শত্রুমধ্যে ফেলিয়া যাইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কিন্তু শেষে বৃদ্ধের

কঠোর আদেশ শুনিয়া তাঁহাকে যাইতে হইল। শঙ্কর চলিয়া গেলে রণজিৎ ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিলেন,—"মা! মা! আসিবার সময় হইয়াছে, এবার তবে আয় মা!" কিন্তু তিনি বুঝিলেন, এখনও আসিতে বিলম্ব আছে, এখনও ঠিক্ সময় হয় নাই, এখনও তিনি অক্ষতদেহে রণস্থলে দণ্ডায়মান। চিন্তামাত্র রণজিৎ দ্রুত অশ্ব চালাইয়া শত্রু-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মোগল সৈন্যগণ 'আল্লা হো আকবর' শব্দে চীৎকার করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল। দূর হইতে রূপনাথ ইহা দেখিলেন; তিনি দুইশত পাইক সৈন্য লইয়া রণজিতের সাহায্যার্থ ছুটিলেন।

———

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—(•)—

বলিদান।

কৃষ্ণকান্ত দ্রুতপদে রণজিৎ রায়ের প্রাসাদ সমীপস্থ হইয়া দেখিলেন, সিপাহীগণ প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছে। পঞ্চবিংশতি জন মাত্র প্রহরী প্রাসাদরক্ষায় নিযুক্ত ছিল; তাহারা প্রাণপণে সিপাহীগণকে বাধা দিতেছে। কিন্তু একশত সিপাহীর সম্মুখে সেই কয়জন প্রহরী কতক্ষণ দাঁড়াইবে? অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরই তাহারা একে একে ধরাশায়ী হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বিংশতিজন প্রহরী, সিপাহীর অস্ত্রে আহত হইয়া ধরাশয়ন করিল, কেবল পাঁচজন মাত্র প্রহরী তখনও দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে বাধা দিতে লাগিল। উন্মত্ত সিপাহীগণ 'আল্লা হো আকবর' রবে চীৎকার করিতে করিতে সেই পাঁচজন প্রহরীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কৃষ্ণকান্ত চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, —"চন্দ্রা! চন্দ্রা!" রামরূপ তাঁহার দিকে চাহিয়া ভ্রুকুটী করিল।

এমন সময় কে ঐ ছুটিয়া আসে রমণী? কৃষ্ণকান্ত সভয়ে সবিস্ময়ে দেখিলেন, তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা আলুলায়িত-কুন্তলা অসিকরা এক রমণী দানব-দলনী মূর্ত্তিতে ছুটিয়া আসিতেছে; রমণীর বসনাঞ্চল কটিদেশে বিজড়িত, পূর্ণেন্দু-সুন্দর মুখমণ্ডল রোষদীপ্ত, আয়ত লোচনযুগল বিঘূর্ণিত, মৃণাল-কোমল ভুজে তীক্ষ্ণধার অসি রবিকিরণে ঝলসিত। রমণী মুহূর্ত্তে সেই উন্মত্ত সিপাহীশ্রেণী ভেদ করিয়া দ্বারপথে দাঁড়াইল, মুহূর্ত্তে তাহার করধৃত অসি সম্মুখস্থ সিপাহীর বক্ষঃ ভেদ করিল; শোণিতরঞ্জিত অসি ঘন ঘন নাচিতে লাগিল।

সেই ভীমা প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া সিপাহীগণ স্তম্ভিত হইল, রামরূপ সভয়ে পিছাইয়া আসিল। কৃষ্ণকান্ত ছুটিয়া গিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন; উন্মাদকণ্ঠে বলিলেন,—"চন্দ্রা—আমার চন্দ্রা কোথায়?"

রামরূপ তীব্রদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল, তারপর হস্তস্থিত অসি উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া তাহার স্কন্ধে প্রচণ্ড আঘাত করিল। রামরূপ একবার ফিরিয়া চাহিল, একবার কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—"পার্ব্বতি!" পরক্ষণেই তাহার শোণিতাপ্লুত দেহ পার্ব্বতীর পাদমূলে লুণ্ঠিত হইল।

"এখন চন্দ্রা কোথায়?" বলিয়া পার্ব্বতী সরোষে তাহার

বক্ষে পদাঘাত করিল, তারপর অসিহস্তে উন্মাদিনীর ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিতা হইল।

কিন্তু কয়েকপদ না যাইতেই পার্ব্বতী দেখিল, শঙ্কর অশ্ব ছুটাইয়া বায়ুবেগে সেই দিকে আসিতেছেন। পার্ব্বতী দাঁড়াইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে শঙ্কর প্রায় নিকটে আসিয়া পড়িলেন। তখন পার্ব্বতী যেন শঙ্করের মুখে শত যমদূতের ভীষণ ভ্রুকুটী দেখিতে পাইল, তাঁহার নয়নে প্রতিশোধের করাল বহ্নিশিখা দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পর মুহূর্ত্তেই সে হস্তস্থিত অসি আপনার বক্ষে সবলে বিদ্ধ করিয়া দিল। শঙ্কর নিকটে না আসিতেই তাহার জীবনশূন্য দেহ ভূলুণ্ঠিত হইল। শঙ্কর নিকটে আসিয়া দেখিলেন, পার্ব্বতীর দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে, অতৃপ্ত বাসনার শত হাহাকার হৃদয়ে লইয়া পার্ব্বতী অনন্ত নরকের পথে যাত্রা করিয়াছে। শঙ্কর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অশ্বে কষাঘাত করিলেন।

তখন ভৈরবীরূপিণী রমণীর অস্ত্রাঘাতে অনেক সিপাহী গতাসু হইয়াছে। অবশিষ্ট সিপাহীগণ বারবার তাহাকে আক্রমণ করিয়াও বিফলকাম হইতেছে; তাহারা ইতস্ততঃ করিতেছে। এমন সময় শঙ্কর আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহা-দিগকে আক্রমণ করিলেন। সিপাহীগণ আর দাঁড়াইতে

পারিল না, তাহারা যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিয়া আত্ম-রক্ষা করিল। তারপর শঙ্কর দ্বারমধ্যস্থিত সেই রমণীমূর্ত্তি দেখিলেন, দেখিয়াই চিনিলেন। তিনি ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠে ডাকিলেন,—"মা, মা! এ কি দেখি মা?"

শঙ্কর অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া প্রণাম করিলেন। রমণী উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন,—"তোমার গুরুপত্নীর আদেশ, তুমি আর যুদ্ধে যাইও না শঙ্কর।"

রমণী দ্রুতবেগে যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিতা হইল। শঙ্কর মুগ্ধনেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর রমণীমূর্ত্তি অদৃশ্য হইলে তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া আহত রামরূপের নিকট দাঁড়াইলেন। কৃষ্ণকান্ত তখনও স্তম্ভিতের ন্যায় সেই খানেই দাঁড়াইয়াছিলেন।

শঙ্কর দেখিলেন, রামরূপের আঘাত গুরুতর। তিনি ডাকিলেন,—"রামরূপ!"

রামরূপ অতি কষ্টে মাথা তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিল। ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল,—"বড় যন্ত্রণা।"

শঙ্কর বলিলেন,—"ভয় নাই, শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতেছি।"

রামরূপ বলিল,—"না, আমাকে স্পর্শ করিও না, আমার মৃত্যু নিকট।"

শ। আমি তোমাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিব।

রা। কেন?

শ। তুমি মহাপাপী হইলেও এখন আহত—দয়ার পাত্র।

রা। বাঁচাইতে পারিবে না। তবে যদি আর একটা উপকার—

শ। কি বল।

রা। চন্দ্রাকে ক্ষমা করিতে বলিও।

শ। তুমি তাহার নিকট কি অপরাধ করিয়াছ?

রা। অপরাধের সীমা নাই। আমি তাহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু—

শঙ্কর রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—"কিন্তু কি?"

রামরূপ একটু থামিয়া আরও ক্ষীণ স্বরে বলিল,—"কিন্তু আমার চেষ্টা সফল হয় নাই। এখনও ধর্ম্ম আছে।"

শ। চন্দ্রা তোমায় ভালবাসে?

রা। ভালবাসিলে বুঝি এরূপে মরিতে হইত না।

একটু বিশ্রাম লইয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল,—"সে পাষাণী তোমাকেই ভালবাসে, আমি কেবল—পুড়িয়া—মরিলাম।"

শঙ্কর ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—"আর একটা কথা, তাহার ধর্ম্ম?"

রামরূপ শেষ নিশ্বাস টানিতে টানিতে বলিল,—"তুমি—মূর্খ—সতীর—ধর্ম্ম, কার—সাধ্য,—ক্ষমা—ক্ষমা—"

রামরূপ চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিল। এতদিনে —বিসর্জ্জনের সময়ে পাপ ও লালসার বলিদান হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

——০:):০:(:০——

ব্রতোদ্যাপন।

এদিকে বহুশত্রুবেষ্টিত হইয়াও রণজিতের হৃদয় কিছু মাত্র ভীত বা বিচলিত হইল না। তিনি সেই জরাদুর্ব্বল হস্তে যুবজনোচিত শক্তি দেখাইয়া সিংহবিক্রমে শত্রু বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই অলৌকিক বীরত্ব, অসাধারণ রণকৌশল দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। কিন্তু একা তিনি, সেই অসংখ্য শত্রুসৈন্যের মধ্যে কতক্ষণ যুঝিবেন? রূপনাথ তখনও শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ক্রমে রণজিৎ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, অসিমুষ্টি শিথিল হইয়া পড়িল, দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসিল, চারিদিক হইতে শত্রুর শাণিত কৃপাণ উত্থিত হইল। রণজিৎ আপনার অবস্থা বুঝিলেন, কিন্তু সে জন্য এতটুকুও কাতর হইলেন না। তিনি কেবল বারংবার সোৎসুক দৃষ্টিতে পশ্চাতে চাহিতে লাগিলেন, রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিতে থাকিলেন,—"মা! মা!"

সহসা কে ঐ আসে রণরঙ্গিনী? রণজিৎ স্থির দৃষ্টিতে দেখিলেন, দৃপ্ত পদভরে রণাঙ্গন কম্পিত করিয়া কোটি-মার্ত্তণ্ডকিরণমণ্ডিতা শোণিত-রঞ্জিত-বসনা মুক্তকেশী অসিকরা ভীমারূপিণী বামা শত্রুসৈন্য পদদলিত করিতে করিতে ভৈরববিক্রমে ছুটিয়া আসিতেছে; বামার নয়নে বহ্নিশিখা জ্বলিতেছে, কুন্দদশনে রক্তাধর দংশিত হইতেছে, পদভরে মেদিনী কাঁপিয়া উঠিতেছে, রূপের প্রভায় রণভূমি উদ্ভাসিত হইয়াছে। সেই ভীমা ভৈরবী মূর্ত্তি দেখিয়া—স্বয়ং বিশালাক্ষী দেবী খড়্গকরে রণাঙ্গনে অবতীর্ণা ভাবিয়া হিন্দুসৈন্যগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। রণজিৎ ভক্তি-উদ্বেলিত কণ্ঠে ডাকিলেন,—"মা! মা! আয় মা——"

সব কথাটা শেষ হইল না, শত্রুচালিত একটা তরবারি আসিয়া তাঁহার মস্তকে পতিত হইল। বৃদ্ধের কম্পিত দেহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইতেছিল, রূপনাথ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার সেই অবসন্ন দেহ ধরিয়া ফেলিলেন। রণজিৎ একবার ক্ষীণ দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিলেন, তারপর সেই ব্রাহ্মণের ক্রোড়েই ধীরে ধীরে নয়নদ্বয় চির-মুদ্রিত করিলেন। রূপনাথের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সহচর পাইকগণও আসিয়া জুটিল। রূপনাথ তাহাদের কয়েক জনের হস্তে রণজিতের দেহরক্ষার ভার দিয়া অসিহস্তে

উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি একবার উদাস দৃষ্টিতে রণভূমির চতুর্দ্দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, তাঁহার সহচর একশত সৈন্য ব্যতীত প্রায় আর সকলেই একে একে ধরাশায়ী হইয়াছে। কেবল কিছুদূরে শতাধিক মাত্র সৈন্য দুই সহস্র বিপক্ষের মধ্যে দাঁড়াইয়া তখনও অমিতবিক্রমে শত্রুসংহার করিতেছে। রূপনাথ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া একবার পশ্চাতে চাহিলেন, কমলার ভীষণ সংহারিণী মূর্ত্তি তাঁহার নয়নে পড়িল। অমনই তিনি ভীম হুঙ্কার ত্যাগ করিয়া শত্রুসৈন্যমণ্ডলী মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন। রুদ্ধকণ্ঠে একবার শেষ ডাকিলেন, 'জয় জগদীশ হরে'; একশত পাইকের কণ্ঠে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিল, "জয় জগদীশ হরে!"

দলে দলে শত্রুসৈন্য আসিয়া রূপনাথ ও তাঁহার অনুচরগণকে বেষ্টন করিল। পাইকগণ প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সেই অসংখ্য শত্রুর সহিত এই কয়জন অস্ত্রহীন লাঠীমাত্র সম্বল সৈন্য অধিকক্ষণ যুঝিতে পারিল না, অচিরেই তাহারা একে একে ধরাশয়ন করিতে লাগিল; কিন্তু একজনও পশ্চাৎপদ হইল না। তখন রূপনাথের বাহ্যজ্ঞান এক প্রকার তিরোহিত। তাঁহার হস্তস্থিত অসি কেবল ঘুরিতেছে, আর রাশি রাশি শত্রুমুণ্ড পদতলে লুটাইতেছে। সেই স্তূপীকৃত শত্রুমুণ্ডের উপর

দাঁড়াইয়া রূপনাথ রুদ্রমূর্ত্তিতে কেবল শত্রু সংহার করিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিতেছেন, 'জগদীশ হরে!' শত্রুগণ দৃঢ় সংকল্প সহকারে তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছে।

এ দিকে শত্রু সংহার করিতে করিতে কমলা তাঁহার নিকটে আসিল। বিপক্ষগণ সেই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দর্শনে ভয়ে বিস্ময়ে সরিয়া যাইতে লাগিল। কমলা আসিয়া রূপনাথের পার্শ্বে একবার দাঁড়াইল, একবার শোণিতসিক্ত অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ললাটের স্বেদ মোচন করিল। রূপনাথ ফিরিয়া চাহিলেন; সেই অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিত হইলেন। একবার ক্লান্ত কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন,—"কমলা!"

সেই মুহূর্ত্তে একজন সৈনিক রূপনাথের বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া বর্শা তুলিল; মুহূর্ত্তে কমলা লাফাইয়া রূপনাথের সম্মুখে পড়িল। বর্শা সবেগে আসিয়া কমলার কোমল বক্ষঃ ভেদ করিল, কমলা, রূপনাথের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। রূপনাথ দৃঢ় মুষ্টিতে অসি চালনা করিয়া আঘাতকারীর মস্তক ছিন্ন করিলেন। তখন চারিদিক হইতে অসিধারা আসিয়া তাঁহার দেহের উপর পড়িতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা ছুটিল। তথাপি রূপনাথ যুদ্ধবিরত হইলেন না। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অসিচালনা করিতে লাগিলেন।

তাহার পর মুষ্টি ক্রমে শিথিল হইল, চারিদিক অন্ধকার

হইয়া আসিল, কম্পিত অবসন্ন হস্ত হইতে অসি খসিয়া পড়িল, পদতলে পৃথিবীটা ভীম শব্দে ঘুরিতে লাগিল। রূপনাথ আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, তাঁহার শোণিতাপ্লুত কম্পিত অবসন্ন দেহ কমলার বক্ষের উপর পতিত হইল। বাঙ্গালার গগন বিদীর্ণ করিয়া একটা 'হায় হায়' শব্দ উঠিল; সূর্য্য দেব অস্তাচলে মুখ লুকাইলেন; একটা বিরাট অন্ধকারে দেশ আচ্ছন্ন হইল।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বিসর্জ্জন না বোধন?

যুদ্ধশেষে ক্লান্ত মোগল সৈন্যগণ শিবিরে প্রত্যাগমন করিল। কয়েকজন অনুচরের সহিত শঙ্কর যুদ্ধস্থলে আসিয়া শবরাশির মধ্যে কাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর যাহাকে খুঁজিতেছিলেন, তাহাকে পাইলেন। তিনি স্বহস্তে শবরাশি সরাইয়া রূপনাথের দেহ বাহির করিলেন। তখনও সে দেহে প্রাণ আছে। ভৃত্যের নিকট জল ছিল; শঙ্কর, রূপনাথের মস্তক আপনার অঙ্কে রাখিয়া সেই জল অল্পে অল্পে তাঁহার মুখে দিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে রূপনাথ ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিলেন; ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন,—"মা!"

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে শঙ্কর ডাকিলেন,—"ঠাকুর!"

রূপনাথ চক্ষু মেলিয়া শঙ্করের মুখের দিকে চাহিলেন। শঙ্কর বলিলেন,—"একি হইল ঠাকুর?"

রূপনাথ ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—"কি হইল শঙ্কর?"

শঙ্কর বলিলেন,—"কিছুই যে হইল না ঠাকুর?"

ধীরে ধীরে রূপনাথ বলিলেন,—"এই কয়টী জীবনের বিনিময়ে যাহা হওয়া সম্ভব, তাহাই হইয়াছে। অত্যাচারের দমন হইয়াছে, অত্যাচারী শাস্তি পাইয়াছে, সংকল্প সিদ্ধ হইয়াছে। তবে আর দুঃখ কি শঙ্কর?"

শঙ্কর বলিলেন,—"কিন্তু ইহাই কি শেষ?"

রূপনাথ অপেক্ষাকৃত দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"শেষ নহে, ইহাই আরম্ভ—ইহাই বোধন।"

শঙ্কর বলিলেন,—"কিন্তু প্রতিষ্ঠা কবে হইবে?"

রূপনাথ আবার একটু জলপান করিলেন। তারপর একটু বিশ্রাম করিয়া বলিলেন,—"তাহার এখনও অনেক দিন বাকী। এখনও বাঙ্গালী অশিক্ষিত, এখনও তাহারা আপনাকে চেনে নাই, এখনও তাহারা প্রাণ দিয়া মাতৃপূজা করিতে শিখে নাই।"

শঙ্কর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"সে শিক্ষা আর কে দিবে ঠাকুর ? আপনি যে চলিলেন ?"

রূপনাথের মৃত্যুচ্ছায়া-কবলিত মুখের উপর হাস্যের ক্ষীণ জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। তিনি শান্তকণ্ঠে বলিলেন,— "আমি কোথায় যাইব শঙ্কর ? এমন সোণার বাঙ্গালা ছাড়িয়া কোন্ বৈকুণ্ঠে গিয়া সুখী হইব ? এক জীবনে তো সব শেষ হয় না। অনন্ত জীবন, অনন্ত সংকল্প, অনন্ত কার্য্য। ভয় কি শঙ্কর! আবার আমি আসিব, আবার বাঙ্গালী হইয়া জন্মিব, আবার বাঙ্গালীকে মাতৃপূজা শিখাইব, আবার এমনই করিয়া মরিব।"

ক্রমে কণ্ঠ ক্ষীণ হইল, স্বর জড়াইয়া আসিল। রূপনাথ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিলেন,—"আগে— বোধন—পরে—মার পূজা—মা—মা—আমার——"

কথা শেষ না হইতেই রূপনাথ ধীরে ধীরে নয়ন নিমীলিত করিলেন। শঙ্কর চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

তারপর শঙ্কর, ব্রাহ্মণদম্পতীর সেই শবদেহ ব্রাহ্মণ দ্বারা বহন করাইয়া বিশাই দীঘির তীরে আনিলেন। তথায় চন্দন কাষ্ঠের চিতার উপর দেহদ্বয় স্থাপিত করিয়া ভস্মীভূত করিলেন। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে চিতানল নির্ব্বাপিত হইল। বিশাই দীঘির জলে পবিত্র চিতাভস্ম ধৌত করিয়া শঙ্কর কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিলেন।

উপসংহার

যুদ্ধজয়ের পর মোগল সেনাপতি কৃষ্ণকান্তকে কৃতকার্য্যের পুরস্কার দিতে চাহিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত তখন অন্তরে অন্তরে কৃতকার্য্যের পুরস্কার ভোগ করিতেছিলেন। তিনি পুরস্কার স্বরূপে শঙ্করকে ক্ষমা করিবার নিমিত্ত সেনাপতিকে অনুরোধ করিলেন। সেনাপতি প্রথমে সম্মত হইলেন না; কিন্তু শেষে তাঁহার প্রদত্ত বিবিধ উপহারে সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্করকে ক্ষমা করিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার পৈতৃক জমিদারীর অধিকারী স্থির করিয়া দেড় সহস্র মাত্র সৈন্য সহ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কৃষ্ণকান্তের হৃদয়ে তখন অনুতাপাগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল। তিনি সত্বর চন্দ্রার সহিত শঙ্করের পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করাইয়া, আপনার সমস্ত সম্পত্তি যৌতুকস্বরূপ কন্যা জামাতাকে দান করিলেন। এই সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া তিনি তীর্থভ্রমণচ্ছলে বহির্গত হইলেন। তদবধি তাঁহার আর কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই।

শঙ্কর বিপুল জমিদারীর অধীশ্বর হইয়া প্রথমেই বিশাই দীঘির তীরে—যেখানে বিপ্রদম্পতীর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল, সেই স্থানে সুবৃহৎ মন্দিরের সহিত অতিথিশালা নির্ম্মাণ

করাইলেন। সেই অতিথিশালার নাম হইল, "বোধনাবাস"। তৎপরে তিনি প্রতি বৎসরান্তে তথায় এক মেলা বসাইলেন। ইহার পর তিনি রূপনাথের উচ্চশিক্ষা হৃদয়ে জাগাইয়া জ্যেষ্ঠ-তাতের পদাঙ্কানুসরণে প্রজাপালনে মনোনিবেশ করিলেন।

কীর্ত্তিবিনাশী কালের প্রবল স্রোতে সেই মন্দির, অতিথি-শালা, রাজভবন প্রভৃতি বহুদিন বিধৌত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও তথায় সেই বিশাল দীর্ঘিকা বাঙ্গালার সেই অতীত কাহিনী হৃদয়ে লুকাইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখনও প্রতি বৎসর তথায় বৃহতী মেলা বসিয়া থাকে। এখনও বৎসরান্তে বহু দেশ দেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র নরনারী আসিয়া সেই বিপ্রদম্পতীর চিতাভস্মপূত দীর্ঘিকার সুপবিত্র বারিস্পর্শে আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করে।

কিন্তু কৈ রূপনাথ! শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গেল, তুমি তো আর আসিলে না? হতাশ হৃদয় বাঙ্গালীকে শুনাইয়া শুনাইয়া আর তো কাহাকেও তেমনই করিয়া সেই অতীত মহাগীতি গাহিতে শুনিলাম না,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

সমাপ্ত।